ত্রিপুরার উপজাতি নৃত্য
একটি সমীক্ষা

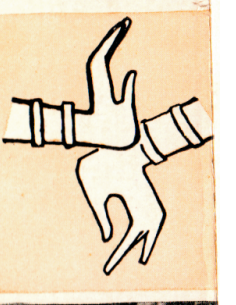

ডঃ পদ্মিনী চক্রবর্তী

ত্রিপুরার উপজাতি নৃত্য ঃ
একটি সমীক্ষা

শ্রীমতী (ডঃ) পদ্মিনী চক্রবর্ত্তী
অধ্যাপিকা,
ত্রিপুরা সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়

DIRECTORATE OF RESEARCH
DEPARTMENT OF WELFARE FOR SCH. TRIBES
GOVERNMENT OF TRIPURA

TRIPURAR UPAJATI NRITYA : EKTI SAMIKSHA

1st Edition, March 1992.

Copy Right Reserved by the Directorate of Research
Government of Tripura.

Published By :
The Directorate of Research
Government of Tripura

Designed and Printed by :
Imprint off-set Press
Dainik Sambad Bhavan
Agartala—Tripura

প্রাক কথন

শ্রীমতী পদ্মিনী চক্রবর্ত্তী নৃত্য শাস্ত্রের তুলনামূলক - গবেষণায় বিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টরেট - ডিগ্রি লাভ করেছেন । তাঁর পরিচয় সেখানেই নয় । তিনি জন্ম শিল্পী । নৃত্য তাঁর নিছক পেশা নয় । এটা তাঁর আরাধ্য সাধনা । শ্রীমতী চক্রবর্ত্তী ভারতীয় নন্দন শাস্ত্রের শাখা, নৃত্য শাখার এক নিরলস অন্বেষু ছাত্রী । নৃত্যশাস্ত্রে তিনি স্বনামধন্যা হলেও নিরন্তর গবেষণা লিপ্ত । তিনি লোক নৃত্যের মধ্যে সন্ধান করেছেন ভারতীয় নন্দন শাস্ত্র কথিত মুদ্রাভঙ্গী, যা লোকায়ৎ তাই যে চিরায়ৎ - বক্ষমান নিবন্ধগ্রন্থে তিনি তাই দেখাতে প্রয়াস পেয়েছেন ।

ত্রিপুরা সরকারের গবেষণা অধিকার শ্রীমতী চক্রবর্ত্তীর জীবন ব্যপ্ত দীর্ঘ প্রয়াসের একটি খণ্ডিত অংশ পুস্তক আকারে প্রকাশ করে এ ব্যাপারে আরো গভীর ও ব্যপক অনুসন্ধান ও তুলনামূলক আলোচনার জন্য সুধীজনের কাছে অনুরোধ রাখছে ।

২৫/৩/৯২

শ্রী লোকেশ চন্দ্র দাশ

অধিকর্তা,
রিসার্চ ডিরেক্টরেট
ত্রিপুরা সরকার

সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
	প্রাক কথন	iii
১।	সূচী	iv
	ভূমিকা	vii
২।	প্রথম অধ্যায়	1—7
	সূচনা	
৩।	দ্বিতীয় অধ্যায়	৪—35
	উপজাতি জনগোষ্ঠীর পরিচয়	
	উৎপত্তি ও সঙ্করণ	
	ত্রিপুরী	10
	জমাতিয়া	14
	নোয়াতিয়া	15
	রিয়াং	16
	উছই	18
	হালাম	19
	গারো	20
	চাকমা	22
	মগ	23
	মিজো	24
	কুকি	26
	দারলং	27
	চাইমল	28
	খাসিয়া	29
	ভুটিয়া	30
	লেপচা	30
	সাঁওতাল	31
	ভীল	32
	ওঁরাও	32

বিষয় পৃষ্ঠা

মুণ্ডা 33
রূপিনী 34
কলই 34
মলশুম 35

৪। তৃতীয় অধ্যায় 36—60

ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্যের তালিকা এবং ত্রিপুরার প্রতিনিধি স্থানীয় উপজাতীয় নৃত্যগুলির অঞ্চলভিত্তিক ও বিষয়বস্তুভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ এবং ত্রিপুরার কৃষিভিত্তিক নৃত্যগুলোর আলোচনা ও বিশ্লেষণ।

ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্যগুলোর তালিকা 36
ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্যগুলোর শ্রেণীবিভাগ 37
কৃষিভিত্তিক নৃত্য 41
ত্রিপুরী উপজাতিদের জুম নৃত্য 43
ত্রিপুরী উপজাতিদের লেবাঙ বুমানি নৃত্য 46
হালাম উপজাতিদের জুম নৃত্য 50
নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের জুম নৃত্য 51
মলশুম উপজাতিদের জুম নৃত্য 53
গারো উপজাতিদের জুম নৃত্য 57

৫। চতুর্থ অধ্যায় 61—80

ত্রিপুরার উপজাতিদের আচার-অনুষ্ঠানমূলক নৃত্যগুলোর আলোচনা ও বিশ্লেষণ

আচার-অনুষ্ঠানমূলক নৃত্য-আলোচনা

ত্রিপুরার উপজাতি ভেদে আচার-অনুষ্ঠানমূলক নৃত্যগুলোর আলোচনা

ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের 'মামিতা' নৃত্য 64
রিয়াং উপজাতিদের আচার-অনুষ্ঠানমূলক নৃত্য 71
হালাম উপজাতিদের লক্ষ্মীপূজার নৃত্য 73
কুকি উপজাতিদের 'থাইডর' নৃত্য- 74
চাকমা উপজাতিদের 'থানমানা' নৃত্য 75
মগ উপজাতিদের 'ফোরারিখো' এবং 'পেদেসা' বা 'পেসে ঃ য়ে' নৃত্য 76
গারো উপজাতিদের 'গ্রাতুলি' নৃত্য ও 'মাংরিয়া' নৃত্য 77

বিষয়		পৃষ্ঠা
	খাসিয়া উপজাতিদের 'পাস্-তি-এ' নৃত্য	79
	ওঁরাও উপজাতিদের 'করমা' নৃত্য	80
৬।	পঞ্চম অধ্যায়	81—110
	ত্রিপুরার উপজাতিদের উৎসব কেন্দ্রিক নৃত্যগুলোর আলোচনা ও বিশ্লেষণ	
	উৎসব ও উৎসব কেন্দ্রিক নৃত্যগুলোর পরিচয়	81
	ত্রিপুরী উপজাতিদের গড়িয়া নৃত্য	82
	রূপিনী সম্প্রদায়ের গড়িয়া নৃত্য	90
	রিয়াং সম্প্রদায়ের ভারসাম্যের নৃত্য বা হজাগিরি নৃত্য	93
	চাকমা উপজাতিদের বিজু নৃত্য	95
	গারো উপজাতিদের 'ওয়াংলা' নৃত্য	97
	মগ উপজাতিদের 'পংখু আকা' ও 'বিয়াসা' নৃত্য	98
	সাঁওতাল সম্প্রদায়ের 'দাঁ-বাপ্‌লা' নৃত্য	100
	ওঁরাও উপজাতিদের 'ফাগুয়া' নৃত্য	101
	মুণ্ডা উপজাতিদের 'ঝুমুর' নৃত্য	102
	কুকী উপজাতিদের 'তাঙ্গডাম' নৃত্য	103
	দারলং সম্প্রদায়ের 'জ্যাঠলুয়াং' নৃত্য	103
	মিজো উপজাতিদের 'চেরো' নৃত্য	107
	মিজো উপজাতিদের 'খোয়াল্লাম' নৃত্য	108
	মিজো উপজাতিদের 'ছেইলাম' নৃত্য	109
৭।	ষষ্ঠ অধ্যায়	111—120
	উপসংহার	111
	গ্রন্থপঞ্জী	116

ভূমিকা

ত্রিপুরার উপজাতি নৃত্য ঃ একটি সমীক্ষা

সাহিত্যই বলি আর সংস্কৃতিই বলি, তার একটা অতীত ইতিহাস আছে। 'অতীত' আছে বলেই 'বর্তমান' এতো সুন্দর। 'আদি' না থাকলে 'আধুনিক' শব্দটিও অভিধানে পাওয়া যেত না।

জগত যতোই এগিয়ে চলেছে ততোই অতীত রুক্ষ খোলস ছাড়িয়ে একটা মনোহারিত্বের ছাপ এনে দিচ্ছে। কিন্তু এই 'মনোহারিত্ব' আকস্মিক নয়। 'আদি' -র বিবর্তনের মধ্য দিয়েই 'বর্তমান' সুন্দর হয়ে উঠছে। শিক্ষিত মনের চর্চ্চা এবং গবেষণার মধ্য দিয়েই অতীত অবহেলিত না হয়েও আধুনিক জগতে আরো সৌন্দর্য-মণ্ডিত হয়ে উঠছে। তা যেমন ভাষার ক্ষেত্রে, তেমনি বিভিন্ন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে।

ত্রিপুরা ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ত্রিপুরার লোকনৃত্যের একটি প্রাচীন বা আদিরূপ আছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যে সমস্ত উচ্চাঙ্গনৃত্য সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তার অতীত নৃত্যশৈলীকে গবেষণার মধ্য দিয়েই বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, কিন্তু ত্রিপুরার লোকনৃত্য নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে বিগত কয়েক-বৎসর ধরে। তাই ত্রিপুরা "নৃত্যে উপেক্ষিতা" হয়ে থাকছে। যে প্রচার এবং প্রসারের চেষ্টা কয়েক-বৎসর ধরে চলছে তা-ও উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু একে সম্ভাবনাময় করে তোলা যায় শুধু মঞ্চে শিল্পীদের তুলে দিয়ে নয়। প্রয়োজন আলোচনা, কর্মশালা এবং গবেষণার।

আরো একটি দিকে নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে তা হল—নৃত্য বিবর্তনের তথ্যাবলী সংগ্রহ করে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া। বিশেষ করে যে সমস্ত নৃত্য চর্চ্চার অভাবে এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক কারণে নিশ্চিহ্ন হয়ে চলেছে সে সমস্ত নৃত্যের চিত্র সংগ্রহ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

আমার সীমিত ধ্যানধারণায় ত্রিপুরার লোকনৃত্যের যে বিশেষ বিশেষ রূপ লক্ষ্য করেছি—তাই এই সমীক্ষায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছিমাত্র।

ডঃ পদ্মিনী চক্রবর্ত্তী

প্রথম অধ্যায়

ভারতের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত ত্রিপুরার উপজাতি সম্প্রদায়ের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি স্বকীয় মহিমায় ও বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল । ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্যকলার মত এত বৈচিত্র্যপূর্ণ নৃত্যকলার সম্ভার অন্যত্র খুব কমই দেখা যায় । বৈচিত্র্যপূর্ণ এই কারণে যে ত্রিপুরার বসবাসকারী ১৯টি উপজাতি জন গোষ্ঠীগুলির মধ্যেই বৈচিত্রতা বিদ্যমান । এই ১৯টি উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে অঞ্চলগত বৈচিত্র থাকলেও সংস্কৃতিগত ঐক্য বর্তমান ।

ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্যকলা নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে পৃথিবী তথা ভারতবর্ষের নৃত্যকলার উৎসের সন্ধান করতে হবে । কারণ পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের লোকনৃত্যের মূল উৎসগুলো একই সূত্রে গাঁথা । ভারতীয় নৃত্যের উৎস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে যে সারা পৃথিবীর আদিম নৃত্যকলার উৎস এবং ভারতীয় লোকনৃত্যকলার

উৎসের মধ্যে মূলগত তেমন কোন পার্থক্য নেই । পার্থক্য যা তা হল স্থানিক । কারণ একটা সীমা পর্যন্ত মানুষকে একই জান্তব বিবর্তনে বিবর্তিত হতে হয়েছে । তারপর প্রত্যেক দেশের স্থানীয় প্রভাবে সেই সব দেশের চিন্তার কাঠামো, শিল্পের স্ফুরণ প্রভৃতির গতি, প্রকৃতি আলাদা হয়েছে । সেই জন্যই ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্যের উৎপত্তি নিয়ে সন্ধান করাকালীন ভারতীয় নৃত্যের উৎসকে পটভূমিকায় রেখে আলোচনা করব । কারণ, নৃত্যের মূল উৎস একই এবং তার স্রষ্টা মানুষই–এই সত্যটি সামনে রেখে ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্যকলার উৎস সন্ধান করা দরকার ।

বৃহত্তর অর্থে উপজাতীয় নৃত্যগুলোকে লোকনৃত্য বলে আখ্যায়িত করা হলেও সব লোকনৃত্যই উপজাতীয় নৃত্য নয় । সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাসে উপজাতীয় নৃত্য বা লোকনৃত্য কোন বিচ্ছন্ন ঘটনা নয় । মানুষের সমাজজীবনে আদিমকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ক্রমবিকাশের ধারার মধ্যেই এই নৃত্যের উদ্ভব এবং নানা শাখা-প্রশাখায় তার বিস্তার । আদিমকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এই ভারতীয় নৃত্যকলা একটি ধারাবাহিকতার অনুসারী ।

প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ । হাজার হাজার বছর ধরে ক্রমবিবর্তনের ফলে উন্নত প্রাণী থেকে মানুষের (Homosapients) সৃষ্টি হয়েছে । প্রাকৃতিক পরিবেশকে অবলম্বন করে নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে মানুষ ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে

গেছে। সেই সঙ্গে নিজের প্রাত্যহিক জীবনের ছন্দকে ধীরে ধীরে নৃত্যে রূপান্তরিত করে নৃত্যকলাকে জয়যাত্রার পথে টেনে নিয়ে গেছে।

বন্য অবস্থায় মানুষ প্রকৃতির নিয়মে তার জীবনকে পরিচালিত করত। নৃতত্ত্ববিদদের মতে প্রস্তর যুগে মানুষের আদিম উল্লাস প্রকাশের মাধ্যম ছিল নৃত্য। সেই আদিম যুগে নৃত্যে কোন তাল ও লয়ের অনুভূতি ছিল না। শুধু ছন্দে ছন্দে প্রাণের উল্লাস ও আকাঙ্ক্ষাগুলো প্রকাশ হত। তখনও কোন ভাষা ছিল না। কোন গান ছিল না। ছিল শুধু অভিব্যক্তি। আদিম যুগের মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বিচরণ করতে করতে নৃত্যের ভিতর দিয়ে তাদের মনোবৃত্তিকে প্রকাশ করত। এটাই ছিল নৃত্যের আদিম পর্যায়। এ'কে বলা যায় লোকনৃত্যের শুরুর কাজ।

আদিম জীবনে নারী-পুরুষ উভয়েই খাদ্য আহরণ ও আত্মরক্ষায় আত্মনিয়োগ করত। গোষ্ঠী সংঘর্ষে বিজয়ে, আত্মরক্ষায় সফলতা এবং অধিক খাদ্য আহরণের আনন্দের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করতে গিয়েই সৃষ্টি হয় নৃত্যের। নব্য প্রস্তর যুগের বিভিন্ন ভাস্কর্যের যে নিদর্শন মেলে সেগুলো থেকে নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গিমার ধারা সম্পর্কে ধারণা জন্মায়।

সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষের জীবনযাত্রার গতি অনুধানব করলে দেখা যাবে আদিমযুগের নৃত্যকলার প্রাথমিক স্তরটি তিনভাগে বিভক্ত–শিকারভিত্তিক জীবন/পশুপালকভিত্তিক জীবন/কৃষিভিত্তিক জীবন। এই তিন ধরণের জীবনই নৃত্যে রূপ পেয়েছে।

শিকারভিত্তিক জীবন–আদিম মানুষের অগ্রগতির পরিচয় থেকে জানা যায় যে মানুষ প্রথমে ছিল শিকার- জীবি। এই জীবনে আদিম মানুষ যাযাবর ছিল ও শিকারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। সে সময়কার মানুষের নৃত্যের মধ্যে শিকারের অনুকরণীয় নৃত্যই ছিল প্রধান। হিংস্র পশু বধ করে যে উল্লাস হত তার প্রকাশার্থে অনুকরণ করা হত সেই দৃশ্যের। নৃত্যে প্রতিফলিত হল শিকারভিত্তিক জীবনধারা। ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন নাচ শিকারী নাচ।

পশুপালকভিত্তিক জীবন–ক্রমবিবর্তনের অগ্রগতির পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ পশুপালকভিত্তিক জীবন ধারায় অভ্যস্ত হল। এই সময় থেকেই মানুষের অর্দ্ধ-যাযাবর জীবনযাত্রার শুরু এবং এই সময়ে শিকার ও পশুপালন এই উভয়বৃত্তিই মানুষের জীবনের অবলম্বন ছিল। পশুপাখীর বিচরণের অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করা হত নৃত্যের মাধ্যমে। পশুপালকভিত্তিক জীবনের প্রতিচ্ছবি নৃত্যে রূপায়িত হল।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় অষ্ট্রিক জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জোয়াং উপজাতিদের মধ্যে ভাল্লুক, পায়রা, মোরগ, বাঁদর, ব্যাঙ ইত্যাদির অনুকরণে নৃত্যের প্রচলন দেখা যায়। যেমন দেখতে পাওয়া যায় সিংহলের 'বন্নম' নাচগুলির মধ্যে। এই নাচগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাণী জগতের বিভিন্ন পশুপাখীর গতিভঙ্গী ও গুণাবলী নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কবিতা সুর সহযোগে গাওয়া হয় এবং নৃত্যে শিল্পী বর্ণিত জীবজন্তুর গতিভঙ্গীকে অনুকরণ করে দেখিয়ে থাকেন। তেমনি ত্রিপুরার মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর উপজাতিদের মধ্যেও মোরগ, বাঁদর, টিয়াপাখী, পায়রা, ব্যাঙ ইত্যাদির অনুকরণে নৃত্যের ভঙ্গী দেখতে পাওয়া যায়। এই সবগুলো পশুপাখীদের অনুকরণে নৃত্য পশুপালক জীবনের স্মৃতি বহন করে।

কৃষিভিত্তিক জীবন–মানব জীবনের অগ্রগতির ইতিহাসে একটি উজ্জ্বলতম সংযোজন হল কৃষির আবিষ্কার। কৃষিকার্যের কৌশল করায়ত্ব হবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। এই সময় থেকেই মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাত্রার উন্মেষ হয় এই সময়ে থেকেই। আদিম মানবজাতি উপজাতি স্তরে উন্নীত হয়। প্রকৃতির কর্কশ প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাসস্থানের উন্নতি ঘটে। পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে আবাসস্থলের বিভিন্ন পরিবর্তন হয়। মানুষ কৃষিভিত্তিক জীবনে প্রবেশ করার সাথে সাথে তার জীবন ধারার মধ্যে যেমন আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়, তেমনি মানুষের ও জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নৃত্যকলায়ও তার প্রতিফলন ঘটে। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা এবং প্রাচুর্য দেখা দেওয়ায় ধন্যবাদ জ্ঞাপক অভিপ্রায় (Thanks giving motif) পরিলক্ষিত হয় নৃত্যে। ধীরে ধীরে মানুষের মনে এই ধারনার জন্ম হয় যে বিশেষ ধরনের নৃত্যের বা অনুষ্ঠানের ফলে আকাঙ্খিত বস্তু লাভ সম্ভব। এই স্তর থেকেই সংস্কার বা আচারের (Rituals and rites) জন্ম।

খাদ্যের প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য আহরণের সংগ্রামময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা জন্মায়। ফসল সংগ্রহের সময় এবং কৃষিকার্যের সাফল্য লাভের জন্য বিভিন্ন উৎসবের সৃষ্টি হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির মানসিকতা ও প্রার্থনা নিয়ে জন্ম নেয় Fertility calt নৃত্যের যাদুধর্ম সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মায় এবং ক্রমশঃ ধর্মীয় উৎসবে নৃত্য আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতীয় নৃত্যে মূলতঃ তিনটি সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। (ক) আদিবাসী নৃত্য–আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজ (খ) লোকনৃত্য–গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক গণ সমাজ (গ) উচ্চাঙ্গ নৃত্যে নগরকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি সমাজের চিন্তা-চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে।

ভারতীয় নৃত্যের উৎস সন্ধান করতে হলে আদিম যুগের মানুষের আচার-অনুষ্ঠানের মূল উৎস ও প্রেরণা-গুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

আদিম যুগের মানুষের সুপ্ত বাসনার প্রকাশ হত নৃত্যের অঙ্গভঙ্গীর মধ্য দিয়ে। W. D. Humbly বলেছেন, সভ্যজগতের মানুষের তুলনায় আদিম জাতির মানুষের মধ্যে নৃত্যের গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত বেশী। তাদের মনের যে কোন সুপ্ত ইচ্ছাকে দেহের অঙ্গভঙ্গীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করত।

মানুষ কিভাবে প্রথম নাচতে শিখল সে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্তে কেউ পৌঁছাতে পারেন নি। যারা আদিম মানুষ নিয়ে গবেষণা করেছেন তাদের একাংশের মতে (ক) হিংস্র বন্য জন্তুকে হত্যা করার সময় বা হত্যার পর প্রতিশোধ স্পৃহা অথবা বীরত্ব প্রকাশের জন্য আদিম মানুষ নৃত্য করত। (খ) আবার প্রাকৃতিক ঘটনাবলী তথা আগুন, বৃষ্টি, ঝড় ইত্যাদির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ প্রাকৃতিক দৈব দুর্বিপাককে অতি প্রাকৃত শক্তি মনে করে তাকে তুষ্ট করার জন্য নৃত্য করত। আবার আদিমতম সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি এবং সমাজকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার উপায় হিসাবে ঐন্দ্রিজালিক যাদু ক্রিয়ার অংশ হিসাবে নৃত্যের উদ্ভব হয়েছিল বলে যে সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন—(গ) তাদের মতে ঐন্দ্রিজালিক যাদু ক্রিয়া প্রদর্শনের নৃত্য প্রাচীন সমাজ থেকে সৃষ্টি হয়ে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় যুক্ত হয়ে গেছে। (ঘ) কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন ভাষাহীন আদিম মানুষ হাত-পা নেড়ে মনের আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার জন্য যে অঙ্গভঙ্গী করত তাই ধীরে ধীরে বিবর্তনের পথে রূপ নেয়। (ঙ) কেউ কেউ মনে করেন আদিম মানুষের শ্রমের ব্যবহার এবং তার সঙ্গে যে অঙ্গ বিক্ষেপ যুক্ত ছিল তাই ক্রমে ক্রমে নৃত্যে পরিণত হয়েছে। অনেক সময় শ্রমকে লাঘব করার জন্য নৃত্যের প্রয়োগ উৎপাদনের লক্ষে করা নৃত্যগুলো থেকে এই ধরণা করা চলে যে মানুষের কামনা বা আকাঙ্ক্ষা নৃত্যের জন্ম দিয়েছে।

নৃত্যের উৎস সন্ধান করতে হলে মানুষের ক্রমবিকাশের স্তর বিশ্লেষণ করে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে কিভাবে ক্রমে ক্রমে সমাজ বিকাশের একটির পর একটি স্তর পেরিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হল মানুষের ক্রমবিকাশের সেই আনুপূর্বিক ইতিহাসের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। প্রাচীন মানুষের 'টোটেম বিশ্বাস' অনুকরণ-মূলক যাদু বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মানুষের সৃষ্টিশীল বিকাশের সাথে সাথে নৃত্যের কিভাবে উদ্ভব হয়েছিল তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

অতি প্রাচীন যুগ থেকে সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তনে নৃত্যেরও বিবর্তন ঘটেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলো থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রস্তর যুগ থেকে ধাতুর

যুগে বিভিন্ন নৃত্যরতা মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া গেছে এবং আদিম যুগ থেকে নৃত্যের উৎকর্ষ কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে এর থেকে ধারণা করা যায়।

নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে সব শিল্পকলাই মানুষের জীবিকা থেকে উদ্ভূত ছিল। শিকার, খাদ্য উৎপাদন ইত্যাদি জীবিকার সাথে শিল্পকলাগুলোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিল। যদিও আজ প্রতিটি শিল্পকলা (নাচ, গান, চিত্রকলা, কাব্য ইত্যাদি) এখন পৃথকভাবে বিচার করা হয়। কিন্তু আদিম যুগে সব উপকরণগুলো একই সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। অর্থাৎ সেই সময় সমাজে ব্যক্তি চেতনার থেকে সমষ্টির চেতনা (Collective consciousness) প্রবল ছিল। সমাজে যৌথ বা দলগত নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে সমষ্টির চেতনা থেকে।

আদিম সমাজ ব্যবস্থায় যাদু বিশ্বাস-কে কেন্দ্র করে ধর্ম, দর্শন, দেবদেবীর কাহিনী, ব্রতকথা, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির সাথে সাথে নৃত্য-গীত চলে আসছিল। একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে ধর্মের থেকে নাচ ও গানের সৃষ্টি হয়েছিল। বরং বলা যায় যে মানুষের নাচের সৃষ্টি হয়েছে তার জীবিকার প্রয়োজনে। পরবর্তী সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোকে মানুষের একটি অংশই অপর অংশের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য ধর্মীয় আচরণ হিসেবে ব্যবহার করে। এর ফলেই পৌরাণিক কাহিনী, দেবদেবীর ইতিহাস এবং দেবদেবীকে তুষ্ট করার জন্য নাচ ও গানকে ব্যবহার করার প্রথা চালু হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির নৃতাত্ত্বিক তথ্য থেকে জানা যায় নৃত্যের উৎপত্তির মূলে ছিল–(ক) খাদ্যোৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক এবং (খ) অনুকরণমূলক যাদু বিশ্বাস।

আদিম সমাজ ব্যবস্থায় তাই নাচ, গান শুধুমাত্র অবসর বিনোদনের উপকরণ ছিল না বা নিছক সৌন্দর্য উপভোগের জন্যও নয়। জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ জীবজন্তু, বৃক্ষ, লতাপাতা ও খাদ্যোৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক নানা ব্যবস্থাকে নিজেদের আয়ত্বে আনার জন্য নাচ ও গানের সৃষ্টি করেছে। পরবর্তী সময়ে যাদু বিশ্বাস, মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি যুক্ত হয়েছে। অজ্ঞতা, ভয় আর বিস্ময় থেকে আদিম মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে অতি প্রাকৃত (Supernatural) শক্তি বলে মনে করে এসেছে এবং অতি প্রাকৃত শক্তিকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস প্রবর্তিত হয়েছে। দেব-দেবী ইত্যাদির প্রচলন ঘটেছে এবং দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করার কৌশল হিসাবে যাদু, মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদির ব্যবহার করেছে। তারা এই বিশ্বাস করত যে দৈহিক শক্তির সাথে মানসিক শক্তির সংযোগ ঘটিয়ে যেকোন প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে তারা বশ করতে

পারবে । তাই জীবিকা সংগ্রহের জন্য নাচ, গান, চিত্রকলার নানা রীতি, নীতি ইত্যাদি যাদু বা ম্যাজিক বিশ্বাস-কে আশ্রয় করে গড়ে উঠতে থাকে ।

যখন আদিম মানুষ রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড় ইত্যাদি কামনা করত তখন সে রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক ব্যবস্থাগুলোর অনুকরণে দেহের অঙ্গ-ভঙ্গী করত । যখন সে হরিণ, ভাল্লুক ইত্যাদি শিকার করত বা ধরার চেষ্টা করত, তখন কোন দেবতার কাছে মাথা নত না করে সেই প্রাণীর অনুকরণে নৃত্য করত । আদিম মানুষ বিশ্বাস করত এই অনুকরণ নৃত্যের মাধ্যম তাদের শক্তি ও সাহস বেড়ে যাবে যার ফলে ঐ জীবজন্তুকে কাবু করতে পারবে । তেমনি খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রেও এই ধরনের যাদু বিশ্বাস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল ।

W. D. Humbly অনুকরণ নৃত্য সম্পর্কে বলেছেন যে টোটেম বিশ্বাস থেকেই পশু অনুকৃতিমূলক এই নৃত্য সৃষ্টি হয় এবং আজও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরনের নৃত্যের প্রচলন আছে । তিনি উল্লেখ করেছেন অষ্ট্রেলিয়ার প্রাচীন উপজাতিদের মধ্যে অনুকৃতিমূলক নৃত্য অত্যন্ত জনপ্রিয় । শিকার যে সব উপজাতিদের জীবিকা তাদের টোটেম বিশ্বাস এই নৃত্যের মধ্যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই খুঁজে পাওয়া যায় । W. D. Humbly উল্লেখ করেছেন ভারতের উপজাতিদের মধ্যেও পশুর অনুকৃতিমূলক নৃত্যের প্রচলন রয়েছে ।

কৃষি থেকে উদ্ভূত নাচ সম্পর্কে Humbly এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে আদিম শিকারজীবি মানুষের মধ্যেকার উন্নত অংশ প্রথম কৃষি কাজ শুরু করে । আদিম সমাজে একই সাথে শিকার জীবিকা ছেড়ে মানুষ কৃষি জীবিকা শুরু করেছিল এই কথা বলার কোন যুক্তি নেই অষ্ট্রেলিয়ায় এখনও এমন প্রাচীন উপজাতি রয়েছে যারা কৃষি কাজ আদৌ জানেনা । অথচ তারা দক্ষ শিকারী ।)

কৃষিভিত্তিক নাচকে উপলক্ষ্য করে কোথাও কোথাও নরবলি প্রথার মত পশু-পক্ষী নিধনের আয়োজন ছিল । বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কৃষি ব্যবস্থা তথা জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নৃত্যের প্রচলন ঘটে, নর বা পশু-পাখীর রক্ত ঢেলে জমির উর্বরতা কামনা করা হয় । ভারতের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ফসল নৃত্যের সূত্রপাত ঘটে একই বিশ্বাসের ভিত্তিতে । যদিও এই বিশাল দেশে বহু পৃথক পৃথক উপজাতি জনগোষ্ঠী রয়েছে এবং তাদের মধ্যে পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে । কিন্তু ফসল উৎপাদনকে ভিত্তি করে প্রায় সব কৃষিজীবি উপজাতীয় মানুষের মধ্য থেকে নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছিল এই ধারনা দৃঢ় যুক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ।

সুতরাং ভারতীয় নৃত্যের উৎপত্তির মূলে শিকার এবং খাদ্যোৎপাদন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল এবং অনুকরণমূলক যাদু বিশ্বাসের প্রবর্তন ঘটে ছিল–এই যুক্তি নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য।

উপরোক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয় যে পৃথিবীর যেকোন দেশেই সংস্কৃতির ধারার প্রবাহক হল প্রাচীন আদিবাসী মানবগোষ্ঠী। আদিম মানুষেরাই শিল্প, সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল এবং ক্রমে ক্রমে তা বিকশিত হয়েছে। ভারতেও আদিম অধিবাসীরাই সংস্কৃতির প্রাথমিক ভিত্তি ভূমি রচনা করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে ভারতের প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী ভারতীয় সংস্কৃতির স্রষ্টা নেগ্রিটো জাতির মানুষ সর্বপ্রথম ভারতে আগমন করেছিল। যদিও নেগ্রিটোরা সবচাইতে অনগ্রসর ছিল, তবু নেগ্রিটোরাই ভারতীয় সংস্কৃতির সূত্রপাত করেছিল। পরবর্তী সময়ে ক্রমে ক্রমে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য ও মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ ভারতবর্ষে আগমন করেছিল। এই পাঁচটি জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরাই আদিমকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অনন্য নজীর সৃষ্টি করেছে। যদিও এই পাঁচটি জাতগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর উপজাতিদের দৈহিক গঠন অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্য থেকে সহজেই পৃথক জাতিসত্ত্বার পরিচয়কে চিহ্নিত করা যায়। ধর্মীয় সামাজিক আচার-আচরণের মধ্যেও পৃথক সত্ত্বা রয়েছে। ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে মঙ্গোলীয় উপজাতিদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রা থেকে আচার অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন। তাই উপজাতীয় লোক সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কৃষি জীবনের বাস্তব প্রতিফলন।

এটা বহু আলোচিত যে ত্রিপুরার আদিম উপজাতিরা প্রাচীন মঙ্গোলীয় গোষ্ঠী-ভুক্ত। আদিম মূল জনগোষ্ঠীর যে স্বকীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকে, ঐ জনগোষ্ঠীর শাখা-প্রশাখার মধ্যে তার প্রতিফলন দেখা যায়। তবে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং সমাজের ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক ধারারও বিবর্তন ঘটে। ত্রিপুরার উপজাতিদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

তবে ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্যকলা নিয়ে আলোচনা করার সময় তার একটা পরিধি স্থির করে নিতে হবে, কারণ ভারতীয় নৃত্যের ক্রমবহমান ধারার মধ্যে যে পাঁচটি পর্যায় পরিলক্ষিত হয় (যথা–আদিবাসী নৃত্য, আধা শাস্ত্রীয় আধা লোকনৃত্য, শাস্ত্রীয় বা উচ্চাঙ্গ নৃত্য, নব্য উচ্চাঙ্গ নৃত্য) তার মধ্যে ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্যকলা ত্রিপুরার উপজাতিদের সম্যক বিকাশের সাথে সাথে কোন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তা অনুধাবন করা দরকার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রধান জনগোষ্ঠী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। ত্রিপুরার উপজাতি সম্প্রদায় এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্য ৬টি রাজ্যের বেশীরভাগ উপজাতি সম্প্রদায় ইন্দো-মঙ্গোলীয়গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর এই শাখাটিই উত্তর-পূর্ব ভারতে বড়ো, নাগা, কুকি, অহোম, খাসিয়া ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী হিসাবে বর্তমানে পরিচিত। আসামের বড়োগোষ্ঠীর এক অংশ ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে বলে ঐতিহাসিকদের অভিমত। এই জনগোষ্ঠী ত্রিপুরার প্রধান উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। ই. টি. ডালটন বড়োগোষ্ঠীর সঙ্গে ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর সম্পর্কের দৃষ্টান্ত ব্যক্ত করতে গিয়ে মেজর ফিশারের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন, ত্রিপুরার জনগোষ্ঠী কাছাড়ের বড়ো উপজাতি জনগোষ্ঠীরই একটি অংশ এবং তাদের দৈহিক গঠন, ধর্ম, প্রথা, প্রকরণ ইত্যাদির মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। বড়ো জনগোষ্ঠীর লোকেদের মতই ত্রিপুরার উপজাতিদের শক্তসামর্থ দৈহিক গঠন, জুম চাষ পদ্ধতি এবং সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা পরিলক্ষিত হয়।

আসামের কাছাড়ের বড়ো সম্প্রদায় যে ধরনের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান (Rituals) পালন করে, ত্রিপুরার কিছুসংখ্যক উপজাতি সম্প্রদায়ও একই ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। যেমন–বড়ো সম্প্রদায় একটি বংশদণ্ড (বাঁশ) সামনে রেখে উৎসর্গ ইত্যাদি করে থাকে তেমনি ত্রিপুরীদের মধ্যেও একই ধর্মীয় আচার দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে আচার-অনুষ্ঠানে বংশদণ্ড বা বাঁশের ব্যবহার প্রাচীনতম উপজাতি জনগোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বংশদণ্ড বা বাঁশের ব্যবহার প্রাচীনতম উপজাতি জনগোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বংশদণ্ড বা বাঁশকে উৎসর্গ করার রীতির পিছনে যে আচার-অনুষ্ঠানগুলি আছে তার সঙ্গে খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ধ্বজ উৎসবের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের একটা পরোক্ষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ধ্বজ উৎসবের ধ্বজ বা বংশদণ্ড নিয়ে নানা কিংবদন্তী সেই যুগে প্রচলিত ছিল। যেমন, নৃত্যারম্ভের সময় কাপড় জড়ান ঐ বংশদণ্ড স্পর্শ করার রীতি ছিল। ঐ বংশদণ্ড মন্ত্রপূত করা হত। এর থেকে প্রতীয়মান হয় তখনও লোকায়ত সমাজে এই ধরনের লোকাচার প্রচলিত ছিল।

যারা ত্রিপুরার আদিবাসী হিসাবে পরিচিত, তাদের বলা হয়ে থাকে, 'পুরান ত্রিপুরী'। এছাড়া রয়েছে রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া সম্প্রদায়। উপজাতিদের এই সম্প্রদায়গুলো মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অংশ। কুকি, লুসাই, মগ, চাকমা, হালাম ও গারো এই উপজাতি সম্প্রদায়গুলোর কিছু কিছু লোক ত্রিপুরায় প্রবেশ করে এবং

স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। বর্তমানে উপরোক্ত উপজাতি সম্প্রদায়গুলো ত্রিপুরার স্থানীয় উপজাতি রূপে পরিগণিত হয়ে গেছে।

এছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারত, উত্তর সীমান্ত অঞ্চল এবং মধ্যভারত থেকে কিছু কিছু উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকজন বিভিন্ন সময়ে জীবিকার প্রয়োজনে ত্রিপুরায় এসেছে। উত্তর-পূর্ব ভারত ও মধ্যভারত থেকে আগত এই উপজাতি সম্প্রদায়গুলোকে বহিরাগত উপাজতি বলা হয়ে থাকে।

নিম্নে ত্রিপুরার স্থানীয় উপজাতি ও বহিরাগত উপজাতিদের একটি তালিকা দেওয়া হল।

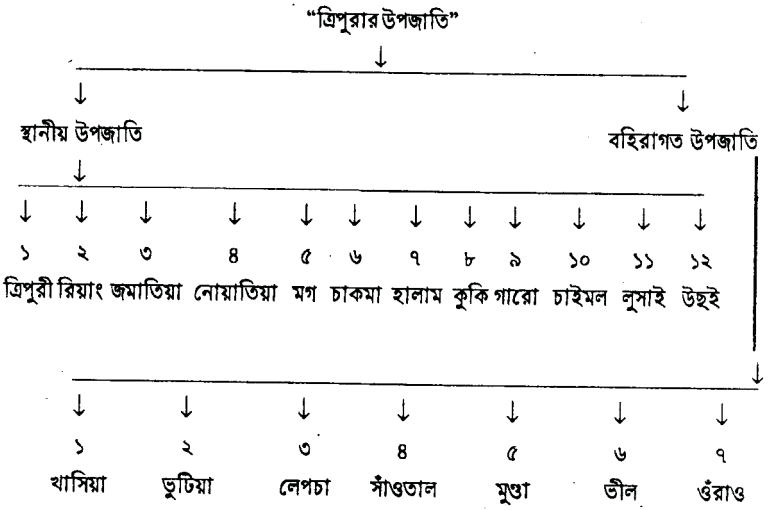

উপরোক্ত ১২টি স্থানীয় উপজাতি সম্প্রদায় এবং ৭টি বহিরাগত উপজাতি সম্প্রদায় সর্বমোট ১৯টি উপজাতি সম্প্রদায় নিয়ে ত্রিপুরার উপজাতি জনসমষ্টি গঠিত। ত্রিপুরার মোট উপজাতি জনসংখ্যার মধ্যে ত্রিপুরী সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫০ শতাংশের বেশী)।

ত্রিপুরায় বসবাসরত উপজাতিদের অঞ্চলভিত্তিতে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে নিম্নে দেখান হল ঃ–

অঞ্চল		উপজাতি
(ক) ত্রিপুরার আদিম উপজাতি	----	ত্রিপুরী, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, হালাম, কুকি, চাইমল
(খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আগত উপজাতি	----	মগ, চাকমা, রিয়াং, উছই
(গ) পূর্বতন বৃহত্তর আসাম থেকে আগত উপজাতি	----	গারো, খাসিয়া, লুসাই
(ঘ) হিমালয় সন্নিহিত উত্তর সীমান্ত অঞ্চল থেকে আগত উপজাতি	----	ভুটিয়া, লেপচা
(ঙ) মধ্যভারত থেকে আগত উপজাতি	----	ভীল, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা

আবার নৃতাত্ত্বিকভাবে ত্রিপুরার উপরোক্ত উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে তালিকাটি দেওয়া হল।

তিব্বত ব্রহ্মী গোষ্ঠী	চীন ব্রহ্মী	অষ্ট্রিক গোষ্ঠী
১। ত্রিপুরী	১। হালাম	১। খাসিয়া
২। রিয়াং	২। কুকি	২। ওঁরাও
৩। নোয়াতিয়া	৩। লুসাই	৩। মুণ্ডা
৪। জমাতিয়া	৪। মগ	৪। সাঁওতাল
৫। গারো	৫। চাকমা	৫। ভীল
৬। লেপচা		
৭। ভুটিয়া		
৮। উছই		

জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করে ত্রিপুরার ১০টি উপজাতি সম্প্রদায়কে প্রধান উপজাতি সম্প্রদায় (Major Tribe) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরা হল (১) ত্রিপুরী (২) জমাতিয়া (৩) রিয়াং (৪) নোয়াতিয়া (৫) চাকমা (৬) মগ (৭) লুসাই (৮) হালাম (৯) কুকি এবং (১০) গারো। অন্যান্য ৯টি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নগণ্য।

ত্রিপুরী

ত্রিপুরী উপজাতিগোষ্ঠী ত্রিপুরার প্রধান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। ইতিহাসবেত্তাদের মতে এ রাজ্যের নামকরণের অন্যতম কারণ এই সম্প্রদায়।

ত্রিপুরী সম্প্রদায় ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর ভোটব্রহ্মী শাখার অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের ভাষা এই গোষ্ঠীর বড়ো (Bodo) শাখার অন্তর্ভুক্ত। বড়ো ভাষার 'বড়ো' শব্দের অর্থ মানুষ এবং ত্রিপুরী ভাষায় 'বরক' শব্দের অর্থও মানুষ। ত্রিপুরী উপজাতিরা নিজেদের ভাষাকে বলে 'কক্-বরক' (কক্–কথা, বরক–মানুষ)।

ত্রিপুরার তিনটি জেলাতেই ত্রিপুরী উপজাতিদের জনবসতি রয়েছে। তবে সদর মহকুমাতেই এদের ঘনবসতি।

মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর মতই ত্রিপুরী উপজাতিদের দেহ সুগঠিত। মাঝারী দৈর্ঘের, বর্ণ হলদে ও বাদামী এবং ঋজু কেশ বিশিষ্ট।

ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর এবং এরা আদিম জুম চাষ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত। জুম চাষ এক জায়গায় করার পর সেই স্থান ত্যাগ করে আবার নূতন জমির সন্ধানে যাত্রা করতে হয়।

বর্তমানে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক প্রথায় সমতলে কৃষিকাজ এবং আদিম পদ্ধতির জুম চাষ উভয়ই দেখা যায়। এছাড়াও ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে বিভিন্ন জীবিকা গ্রহণ করেছেন।

ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের জুমিয়ারা উঁচু বাঁশের খুঁটির উপর বাঁশের পাটাতন নির্মাণ করে তার উপর বাঁশের ঘর তৈরী করে–বন্যজন্তুর হাত থেকে বাঁচার জন্য। একে বলা হয় গাইরিং। এদের প্রধান গৃহপালিত পশু শূকর এবং মুরগী।

ভাত ও মাংস ত্রিপুরী উপজাতিদের প্রধান খাদ্য। পার্বত্য অঞ্চলে মাছ দুষ্প্রাপ্য বলে এদের মধ্যে শুকনো মাছের ব্যবহার অত্যধিক। গৃহস্থালীর প্রয়োজনে মাটির হাড়ি, কলসী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইদানিং অবশ্য ধাতু পাত্রের বহুল ব্যবহার হচ্ছে।

ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মেয়েরা অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মতই পরিশ্রমী এবং কৃষিকাজে পুরুষদের পাশাপাশি কাজ করে। গৃহস্থালীর কাজ ছাড়াও পরিধানের কাপড় বোনা এসব কাজই মেয়েদের করতে হয়। কোমড় তাঁতে (Loin-loom) প্রস্তুত হয় পরিধানের কাপড়। পুরুষদের রি-বরক ও কাংচুলুই এবং মেয়েদের রিগনাই রিসা ইত্যাদি এই তাঁতে নকশা সহ বোনা হয়। মেয়েরা রিগনাই বা পাছড়া লুঙ্গীর মত করে পরে এবং বক্ষাবরনী হিসাবে উর্দ্ধাঙ্গে 'রিসা' ব্যবহার করে। ইদানিং জামা, ব্লাউজ, চাদর, সার্ট ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। মেয়েরা অলঙ্কার পরিধান করতে ভালবাসে। হাতে চুড়ি, বাউটি, গলায় কাঠিছড়া (কণ্ঠী) হার, কানে টেরি,

কানগলা, ওয়ামুর (পাহাড়ী এলাকায় মেয়েরা কানের নিম্নভাগে পরে) এবং কানের উপরিভাগে তৈয়া, নাকে কল্লি ও বালি, পায়ে পায়জোড়, খাড়ু, মাথায় টিকাবন্ধ বা টিকলী, চাঁদতারা, কেশসজ্জায় গলদকি বা গলধুকি, চমাই ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। রৌপ্য নির্মিত গয়নাই প্রধান।

ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই বিবাহ করে। অবশ্য বর্তমানে অন্যান্য গোষ্ঠী, এমনকি অ-উপজাতিদের সঙ্গেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখা যায়।

ত্রিপুরী উপজাতিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ

আদিম বিশ্বাস অনুযায়ী ত্রিপুরী উপজাতিরা একদিকে বস্তুবাদী, আবার তাদের মধ্যে ভাববাদেরও প্রভাব রয়েছে। গড়িয়া, বুড়ামা, মাইলুমা, খুলুমা, নাকুছমাতাই, মতাই, লাঙ্গিয়া, লামপ্রা প্রভৃতি তাদের উপাস্য দেবতা। অন্যান্য পূজা-পার্বনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খার্চ্চিপূজা, কেরপূজা, গাংপূজা বা গঙ্গা পূজা ইত্যাদি। পূজানুষ্ঠানের দিনক্ষণ পরিচালনা করেন 'অচাই'।

ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত পূজা-পার্বনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'গড়িয়া' পূজা। এই উৎসব ত্রিপুরার আদিবাসীদের জাতীয় উৎসব হিসেবে পরিচিত।

ত্রিপুরী উপজাতি জনগোষ্ঠী সংখ্যার দিক থেকে যেমন বৃহত্তম, এদের সামাজিক উৎসব, পার্বন ইত্যাদিও বেশী, তেমনি এই সম্প্রদায়ের নৃত্যকলার সম্ভারও জাকজমকপূর্ণ। ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা ভিত্তি করে উপজাতি লোকনৃত্য উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

এদের প্রধান উৎসব ও নৃত্য হচ্ছে 'গড়িয়া'। ত্রিপুরীরা প্রত্যেকেই এই উৎসবে যোগ দিয়ে থাকে এবং নৃত্য-গীত পরিবেশন করে।

মহাবিষু (মহাবিষুব) সংক্রান্তি বা চৈত্র সংক্রান্তিতে (৩১শে চৈত্র) গড়িয়া পূজার বোধন। বৈশাখের প্রথম ৭ দিন ধরে এই উৎসব চল। ৭ই বৈশাখ উৎসবের পূর্ণাহুতি।

গড়িয়া পূজার শেষ পর্বে গড়িয়া দেবতার প্রতীক বাঁশটি থেকে 'রিসা' বা 'রিয়া' খুলে একটি 'কল' বা বর্শার মধ্যে ঝুলিয়ে দেবভক্তিতে মাতোয়ারা যুবক যুবতীরা

'খাম্' বাদ্যের তালে তালে গান গেয়ে নাচতে শুরু করে। তারপর গড়িয়া দেবতার গ্রাম পরিক্রমা শুরু হয়। প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে গড়িয়া দেবতাকে উঠোনে বসিয়ে যুবক-যুবতীরা গান সহযোগে নৃত্য শুরু করে।

পূর্বে এই গড়িয়া নৃত্যে ১০৮টি ভঙ্গী করা হত (অনেকটা নাট্যশাস্ত্রের ১০৮টি করনের মত)। কিন্তু এতগুলো ভঙ্গী কেউ আয়ত্ত্বে রাখতে পারেনি। এর প্রধান কারণ হচ্ছে নিত্যদিনের চর্চার অভাব। জীবনধারনের তাগিদে নানারূপ জীবিকায় নিয়োজিত থাকার দরুন ও অনেকগুলো ভঙ্গীর বিলুপ্তি ঘটে। সর্বাধিক ২৪/২৫টি ভঙ্গী নিয়ে গড়িয়া নৃত্য করে। আর সর্বনিম্নে ৮/৯টি ভঙ্গী করে।

জুম নৃত্য

জুম নৃত্য ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের অপর একটি ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য। জুমভিত্তিক জীবনযাত্রা এই নৃত্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

লেবাঙ্গ বুমানি

ত্রিপুরী উপজাতি গোষ্ঠীর লেবাঙ্গ বুমানি নৃত্য জুম নৃত্যেরই অঙ্গ। জুমে ফসল হওয়ার পর এক ধরনের পতঙ্গের হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য যুবক-যুবতীরা ফসল ক্ষেতে কাঠি বাজিয়ে পোকাগুলোকে ধরে। এই নৃত্যটিতে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীরা বিভিন্ন প্রকারের নৃত্যকলার মাধ্যমে নিপুণভাবে পোকা ধরার ব্যাপারটি উপস্থাপনা করে।

মামিতা হরাইমানি

জুম নৃত্যের অপর একটি অঙ্গ হচ্ছে 'মামিতা হরাইমানি' নৃত্য। মামিতা হরাইমানি প্রকৃতপক্ষে নবান্ন উৎসব। আশ্বিন মাসের শেষ দিকে জুম থেকে ফসল সংগ্রহ করার পর কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিকে এই মামিতা উৎসব ও নৃত্য-গীত করা হয়।

মশক সুমানি

ত্রিপুরী উপজাতি গোষ্ঠীর অপর একটি নৃত্য হচ্ছে 'মশক সুমানি'। ত্রিপুরার জঙ্গলে হরিণ শিকারের বিষয় নিয়ে মশক সুমানি নৃত্যটি গড়ে উঠেছে। এই নৃত্যটির প্রথম দিকে যুবকরাই অংশগ্রহণ করত। ইদানিংকালে যুবতীরাও এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করছে।

জমাতিয়া

ত্রিপুরার প্রাচীন উপজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে জমাতিয়া সম্প্রদায় অন্যতম। এই জমাতিয়া সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জুম চাষ ছেড়ে হাল চাষ পদ্ধতিতে কৃষিকাজ শুরু করেছে।

জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু আছে। 'অকরা' হচ্ছে জমাতিয়াদের মধ্যে প্রধান ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রশাসক। জমাতিয়া প্রশাসনের কোন পদই বংশানুক্রমিক নয়। নির্বাচনের ভিত্তিতেই এই সমস্ত পদে কোন ব্যক্তিকে বসানো হয়ে থাকে এবং যতদিন তার উপর জনসাধারণের আস্থা থাকে ততদিন তিনি ঐ পদে বহাল থাকেন।

জমাতিয়া উপজাতিরা ত্রিপুরী উপজাতিদের স্বগোত্র। এদের ভাষা কক্‌বরক্‌ ভাষার অন্তর্গত। মেয়েরা কোমরে 'রিগনাই' নামে বস্ত্র পরিধান করে। তারা বক্ষাবরণ হিসাবে 'রিসা' নামে কাপড় ব্যবহার করে।

জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিবাহরীতি মোটামুটি ত্রিপুরীদের অনুরূপ। আলোচনার মাধ্যমে সম্বন্ধ করে বিবাহ স্থির হয়।

জমাতিয়া উপজাতিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ

মৃতদেহ দাহ করা হয়। জমাতিয়াগোষ্ঠীর মুখ্য সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হল 'গড়িয়া পূজা'। ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের গড়িয়া পূজা থেকে জমাতিয়া সম্প্রদায়ের গড়িয়া পূজা পৃথক। প্রথমত গড়িয়া পূজা জমাতিয়াদের কাছে একটি সমষ্ঠিগত উৎসব এবং দ্বিতীয়তঃ একমাত্র জমাতিয়াদের কাছেই গড়িয়াদেবের স্বর্ণমণ্ডিত বিগ্রহ বর্তমান। সমস্ত কক্‌বরক ভাষাভাষীদের গড়িয়া পূজা একই দিনে আরম্ভ হয়। অর্থাৎ বাংলা বৎসরের শেষ দিন থেকে আরম্ভ হয় এবং ৭ দিন ও ৭ রাত্রি পর্যন্ত চলে।

এছাড়াও জমাতিয়াদের মধ্যে লামপ্রা পূজা, মাইলুমা ও খুলুংমা পূজা, তুই-মা পূজা, কের পূজা ইত্যাদি পূজা হচ্ছে। এছাড়া গৃহের মঙ্গলার্থে নক্‌সুমোতাই, কোয়াই চানাইয়া, বুড়াছা ইত্যাদি পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে গৃহীত পূজানুষ্ঠানের মধ্যে আছে দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, শনিপূজা, রথযাত্রা, দোলপূর্ণিমা, ভীম একাদশী ইত্যাদি।

জমাতিয়া উপজাতিদের গড়িয়াপূজা

জমাতিয়া উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও গড়িয়া উৎসবকে কেন্দ্র করে গড়িয়া নৃত্য করা হয়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রতিটি বাড়ীতে গড়িয়া দেবতার মূর্ত্তি নিয়ে যাওয়া হয় এবং তখন যুবক-যুবতীরা উদ্দীপক ঢাকের তালে তালে নৃত্য ও গীত করে। খুব সহজ, সরলভাবে জমাতিয়ারা গড়িয়া নৃত্যটি উপস্থাপনা করে।

পোষাক পরিচ্ছদ ও বাদ্যযন্ত্র

জমাতিয়া সম্প্রদায়ের উপজাতি মহিলারা নৃত্যের সময় রিগনাই ও রিসা পরিধান করে। পুরুষরা ধুতি পরে। এই নৃত্যে খাম ও সুমু (বাঁশী) ব্যবহৃত হয়।

নোয়াতিয়া

ত্রিপুরী ও জমাতিয়া উপজাতিদের সঙ্গে নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের বহুলাংশে সাদৃশ্য দেখা যায়। ব্রহ্মদেশ থেকে তারা বাস্তু ত্যাগ করে ত্রিপুরায় আসে। নোয়াতিয়া উপজাতি লোকেদের ১১টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এরমধ্যে মাত্র ছয়টি শ্রেণীর লোকেরা ত্রিপুরায় বাস করে।

নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন খুবই সুসংবদ্ধ। সাধারণতঃ এদের দৈহিক উচ্চতা কম, গায়ের রঙ ফর্সা। ত্রিপুরার, উদয়পুর, সাব্রুম, কমলপুর, খোয়াই, ধর্মনগর এবং বিলোনীয়া মহকুমায় এদের অধিক সংখ্যায় দেখা যায়।

অতীতে তারা জুম চাষে অভ্যস্ত ছিল। আজকাল এরা কৃষিকার্যের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে। তবে পার্বত্য অঞ্চলে জুম চাষ ও প্রচলিত আছে। নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা বাঁশের তাঁতে নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র নিজেরাই তৈরী করে নেয়। পুরুষরা বাঁশ থেকে নানাপ্রকার ঝুড়ি, চালানি ইত্যাদি তৈরী করে।

নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের সর্দার (রোয়াংদা) নোয়াতিয়া সমাজের সর্বেসর্বা। সমাজের অপরাধ, ব্যাভিচার ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের বিচার তিনিই করেন।

নোয়াতিয়াদের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি ত্রিপুরী ও জমাতিয়াদের অনুরূপ। এরাও কক্‌বরক্ ভাষায় কথা বলে।

হিন্দুরীতি অনুযায়ী মৃতদেহ দাহ করা হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ত্রিপুরী প্রথায়।

নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান

ত্রিপুরী ও জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মত এরাও মাতাই কাতার, গড়িয়া দেবতা ইত্যাদির পূজা করে। শূকর, ছাগল, মোরগ, হাঁস ইত্যাদি দেবতার সামনে বলি দেওয়া হয়। নোয়াতিয়াদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের অনুপ্রবেশের ফলে বৈষ্ণব সংস্কৃতির সংমিশ্রণও ঘটেছে। ত্রিপুরার পার্বত্য চট্টগ্রাম সন্নিহিত অঞ্চলে যে সমস্ত নোয়াতিয়া সম্প্রদায় বসবাস করে তাদের মধ্যে বৈষ্ণব সংকীর্তনের প্রচলন দেখা যায়।

প্রথমদিকে নোয়াতিয়ারা পদবী হিসাবে 'নোয়াতিয়া' শব্দটি ব্যবহার করত। বর্তমানে এরা 'ত্রিপুরা' পদবী গ্রহণ করেছে।

নোয়াতিয়া উপজাতির নৃত্যকলা

নোয়াতিয়া উপজাতি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা জমাতিয়া ও ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মতই। গড়িয়া ও জুম নৃত্য নোয়াতিয়াদের চিরাচরিত নৃত্য। শক্তি ও যুদ্ধের নৃত্য হিসাবে এরা গড়িয়া নৃত্য করে। তবে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের গড়িয়া নৃত্যের মত নোয়াতিয়াদের নৃত্য বহুল প্রচারিত নয়। ত্রিপুরী উপজাতিদের গড়িয়া নৃত্য থেকে এদের গড়িয়া নৃত্য সম্পূর্ণ পৃথকভাবে পরিবেশন করা হয়। তবে নোয়াতিয়া উপজাতিদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত নৃত্য জুম। ত্রিপুরী উপজাতিদের মতই জুম নৃত্যের অনুষ্ঠানগুলো হয়ে থাকে।

পোষাক-পরিচ্ছদ

নৃত্যের সময় মেয়েরা নানা রঙের এবং নকশা করা 'দুররা' (কোমর থেকে পা পর্যন্ত) এবং 'রিসা' (বক্ষ বন্ধনী) পরিধান করে। ছেলেরা ধুতি পরে এবং মাথায় 'কামচেলি' বাঁধে। মেয়েরা গলায় 'ওয়ারেম' (মালা), চাফিরি (হাঁসুলি), বাংবৌতাং (গলার মালা) ইত্যাদি পরিধান করে।

বৃন্দবাদ্য

বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে খাম্ ও সুমুর (বাঁশী) ব্যবহার করা হয়।

রিয়াং

ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে রিয়াং সম্প্রদায়। ত্রিপুরার তিনটি জেলাতেই এরা ছড়িয়ে থাকলেও উত্তর ত্রিপুরায় এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় এদের বসতি বেশী। রিয়াং জনগোষ্ঠী ব্রহ্মদেশের উত্তর পশ্চিম কোন ধরে ক্রমশঃ নাগা

পাহাড় ও মণিপুরকে বাঁদিকে রেখে বর্তমান মিজো পাহাড় অঞ্চলে মায়ানিমলাংয়ে এসে কিছুদিনের জন্য বসতি স্থাপন করে। সেখান থেকে কর্ণফুলী নদীর প্রবাহ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরায় প্রবেশ করে।

রিয়াং উপজাতি সম্প্রদায় দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। যথা–মেসকা (Meska) এবং মরছাই (Marchhai)। এই গোষ্ঠী দুটি আবার বিভিন্ন উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত।

রিয়াং উপজাতিরা তাদের ভাষাকে 'কউ-বরোউ' বলে থাকে। ত্রিপুরী উপজাতিদের ভাষার সঙ্গে কক্‌বরকের সাদৃশ্য রয়েছে।

রিয়াং সম্প্রদায় প্রধানতঃ কৃষিজীবি এবং জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। ভাল ফসলের কামনা করে। এরা বুড়াছার পূজা করে।

নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই রিয়াংদের বিবাহাদি হয়। রিয়াংদের দেবালয়ে নানা দেব-দেবীর অবস্থান আছে। প্রধান দেব-দেবী হল 'মাতাইকাতার' (শিব-দুর্গা) তুইমা (নদীর দেবী), সাংগ্রামা (পর্বতের দেবতা), বুড়াছা (বনদেবতা), খুলুমা (বাস্তুদেবতা), মাইলুংমা (লক্ষ্মী) এবং লাম্‌প্রা।

সাধারণতঃ হিন্দুপ্রথা অনুযায়ী মৃতদেহ দাহ করা হয়। পারলৌকিক ক্রিয়া দুটি স্তরে করা হয়। (১) মৃতদেহ-কে দাহ করা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান করা হয়। অপরটি হচ্ছে বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান।

রিয়াং উপজাতিদের নৃত্যকলা

রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠান অত্যন্ত জনপ্রিয়। রিয়াং উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নৃত্য হল 'হজাগিরি' নৃত্য (Balance Dance)। মাইলুমা ও মাইকাতাল উৎসব উপলক্ষ্যে রিয়াং মেয়েরা 'হজাগিরি' নৃত্যে অংশগ্রহণ করে। এই দুটো উৎসব হল নবান্ন ও লক্ষ্মীপূজা। এই নৃত্যে কোন উদ্দামতা নেই।

ইদানিংকালে রিয়াং উপজাতিরা প্রায় প্রতিটি আনন্দ উৎসবে (যেমন–বিবাহ ইত্যাদি) এই নৃত্যটি করে থাকে। রিয়াং উপজাতিদের মধ্যে অনেকেই জুম নৃত্য করার পর নবান্ন উৎসব উপলক্ষ্যে এই 'হজাগিরি' নৃত্যটি করে। যদিও রিয়াংদের জুম নাচ ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের জুম নাচের তুলনায় দুর্বল।

এছাড়া রিয়াং সম্প্রদায় মৃতদেহ দাহ উপলক্ষ্যে এবং বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে নৃত্য-গীত করে থাকে। এর থেকে ধারণা করা যায় যে, নৃত্যকলা রিয়াং উপজাতিদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এদের ঐতিহ্যগত পোষাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত সাধারণ। মেয়েরা 'রিগনাই সম' (কালো পাছড়া) এবং বক্ষাবরণ হিসাবে 'রেসা' ব্যবহার করে। পুরুষেরা যে কটি বস্ত্র পরিধান করে তার নাম 'রিতুকু রিসামারো' এবং উর্দ্ধাঙ্গে 'কুতাই তা বারাক' (সার্ট) পরে। সমস্ত পোষাকই মেয়েরা কোঁমর তাঁতে প্রস্তুত করে। রিয়াং সম্প্রদায়ের মেয়েরা অলঙ্কার ও ফুল দিয়ে সাজতে ভালবাসে। রূপার অলঙ্কার বিশেষ করে রৌপ্য মুদ্রার হার 'রাংবুতাং' এদের কাছে সম্মানের বস্তু।

বৃন্দবাদ্য

রিয়াং উপজাতিদের নৃত্যে খাম্ বাদ্য ও সুমুই বাঁশী ব্যবহৃত হয়।

উছই

উছই সম্প্রদায় রিয়াং সম্প্রদায়েরই একটি অংশ। রিয়াংরা যখন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তখন চট্টগ্রামে বসবাসকারী সমস্ত রিয়াং সম্প্রদায়কে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানায়। কিন্তু কর্ণফুলী নদীতে ব্যাপক বন্যা দেখা দেওয়ায় রিয়াংদের পক্ষে ঠিক সময়ে পৌঁছে যুদ্ধে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই জন্য ত্রিপুরার রিয়াং সম্প্রদায়রা কর্ণফুলীর ওপারের রিয়াংদের সমাজচ্যুত করেন এবং তাদের 'ওলছই' বলে অভিহিত করেন। ত্রিপুরী ভাষায় 'ওল' শব্দের অর্থ 'পশ্চাৎ' এবং 'ছই' শব্দের অর্থ 'স্বীকার' অর্থাৎ পলায়ন মনোবৃত্তি। যাইহোক, চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর ওপারের রিয়াংদের যে অংশ পরবর্ত্তী সময়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে তাদের 'উছই' বলে অভিহিত করা হয়। এদের রীতিনীতি সবকিছুই রিয়াংদের মতই।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের রাজত্বকাল উছই সম্প্রদায় প্রথম বর্তমান ত্রিপুরায় আসে। প্রথমে তারা মহারাজ কর্তৃক বিলোনীয়া মহকুমার চড়কবাই অঞ্চলে পুনর্বসতি প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী সময়ে ঐ মহকুমারই মুহুরীপুর ও রতনপুরে তারা ছড়িয়ে পড়ে। পরে জীবিকার প্রয়োজনে তারা অমরপুর ও ধর্মনগরের বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করে। এছাড়া জম্পুই পাহাড়ের পাদদেশে ইতস্ততঃভাবে তাদের দেখা যায়।

উছই সম্প্রদায় 'কউব্রু' বা 'কক্বরক' ভাষায় কথা বলে।

উছই উপজাতিদের নৃত্যকলা

উছই উপজাতিদের ধর্মীয় সামাজিক রীতিনীতি উৎসব অনুষ্ঠান রিয়াং উপজাতিদের মতই। উছই উপজাতিদের মধ্যে রিয়াং সম্প্রদায়ের মত 'হজাগিরি' নৃত্য

(Balance Dance) প্রচলিত। উছই গোষ্ঠীরা যেকোন আনন্দানুষ্ঠানে এই নৃত্য করে।

পোষাক-পরিচ্ছদ

উছই সম্প্রদায়ের মেয়েরা ড্রনাই (পাছড়া) ও রিসা পরে। এরা গলায় ২৫ পয়সা ও ৫০ পয়সার মালা পরে। এরা পুঁতির মালার ছড়া তিনটি থেকে চারটি বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়েও পরে।

বৃন্দবাদ্য

উছইদের নৃত্যের সঙ্গে খাম্‌বাদ্য, কুসুম (বাঁশী) এবং স-তা (বড় করতাল) বাজান হয়।

হালাম

নৃতাত্ত্বিকদের মত অনুযায়ী হালাম সম্প্রদায় কুকি সম্প্রদায়ভুক্ত। কোন এক সময়ে হালাম উপজাতিরা ত্রিপুরার শাসক রাজবংশের সংস্পর্শে আসে এবং তারা ত্রিপুরার রাজার বশ্যতা স্বীকার করে। হালাম উপজাতিদের অন্যান্য উপজাতিরা 'মিলা কুকি' বলে। জনশ্রুতি যে তারা মণিপুরের উত্তরে অবস্থিত 'খুরপুইতাভূম' নামে একটি পার্বত্য এলাকা ছেড়ে ত্রিপুরায় আসে।

হালামগোষ্ঠীর নামকরণের কারণ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যায় নি। ত্রিপুরী ভাষায় 'হা' শব্দের অর্থ মাটি বা দেশ এবং 'লাম' শব্দের অর্থ পথ। দেশের পথ অর্থাৎ দেশে প্রবেশের পথ যারা রক্ষা করত তাদের 'হালাম' বলা হত অনুমান করা যায়।

কমলপুর, অমরপুর, বিলোনীয়, কৈলাশহর, ধর্মনগর এবং সদরের অন্তবর্তী অঞ্চল সমূহে হালামদের দেখা যায়। তারা ১৭টি শ্রেণী বা দফায় বিভক্ত।

বেশীরভাগ হালামরাই দ্বিভাষিক এবং তারা ত্রিপুরী বা হালাম এই দুই ভাষাতেই অনর্গল কথা বলতে পারে। এরা জুম চাষে অভ্যস্ত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সমতল জমিতে চাষ-বাস করছে। তারা ছোট ছোট দলে বাস করে। হালাম উপজাতিদের সামাজিক জীবন খুবই সুসংবদ্ধ।

কুকি সম্প্রদায়ের সঙ্গে হালাম উপজাতিদের জাতিগত সাদৃশ্য থাকলেও সংস্কৃতির দিক থেকে তারা ত্রিপুরী উপজাতিদের কাছাকাছি।

হালাম উপজাতিরা অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা করে। পূজায় ছাগল, মোরগ, হাঁস, শূকর, কচ্ছপ ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। হালাম সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান ধর্মীয় সামাজিক,

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল বড় পূজা। সমগ্র অঞ্চলের হালাম জনগোষ্ঠী ৪/৫ বছর পরপর বড় পূজা অনুষ্ঠান করে থাকে। এছাড়া হালামদের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রচলন নেই। দেবতার প্রতীক হিসাবে বংশ দণ্ডকেই তারা পূজা করে।

বর্তমানে ত্রিপুরার হালাম সম্প্রদায়ের মধ্যে খৃষ্টান ধর্মের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ধরণ দেখা যাচ্ছে। পোষাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে।

হালাম সম্প্রদায়ের নৃত্যকলা

হালাম সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবিকা ভিত্তিক 'জুম' নাচের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ত্রিপুরী উপজাতিদের মত এরাও জুম নাচকে ৮টি ভাগে ভাগ করে উপস্থাপনা করে এবং লক্ষ্মীপূজার পর এই নৃত্যের সমাপ্তি ঘটে। ছেলে-মেয়ে উভয়ে মিলে এই নৃত্যটি করে।

পোষাক-পরিচ্ছদ

হালাম গোষ্ঠীর মেয়েরা কোমরে 'নিকনি আমদুখ' বা পাছড়া পরে। এর উপরে 'কুলটাই' বা ব্লাউজ পরে। কোমরে এক টুকরো কাপড় দিয়ে বাঁধে। একে বলে 'কংখিৎ' ছেলেরা ধুতি পরে এবং 'রিয়াম কুলটাই' বা সার্ট পরে এবং মাথায় 'কামসা তাইকু' বা পাগড়ী বাঁধে। হালাম উপজাতির মেয়েরা নানারকম বীজ, শঙ্খ, ঝিনুক প্রভৃতি অলঙ্কার পরতে ভালবাসে।

বাদ্যযন্ত্র

নৃত্যের সময় খুয়াং বা খাম্ বাদ্য ব্যবহার হয়। খুয়াং বা খাম্ বাদ্যযন্ত্র দুজনে মিলে বাজান হয়। একপাশে শুধু হাত দিয়ে এবং অন্যপাশে কাঠি দিয়ে যখন বাজান হয় তখন এই কাঠি দিয়ে বাজানোর পদ্ধতিকে 'দিগিরি ' বলে। নৃত্যের সময় 'সাইলিয়া' বা বাঁশীর ব্যবহার হয়। এছাড়া গীটারও এরা ব্যবহার করে। মিজো উপজাতিদের মত গীটারকে এরা 'টিংটিং' বলে।

গারো

গারো উপজাতির লোকেরা আসামের গারো পর্বতের অধিবাসী। আসামে সমতল ও পর্বতাঞ্চল উভয় স্থানেই গারো সম্প্রদায়েদের দেখা যায়। গারোরা উত্তর আসামের পার্বত্য অঞ্চল থেকে ক্রমশঃ ব্রহ্মপুত্র নদীতীরস্থ বিভিন্ন জনবসতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

পূর্বতন বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পর্বত অঞ্চলে এবং ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে এরা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে।

ত্রিপুরার সদর মহকুমা, কমলপুর, কৈলাশহর, উদয়পুর এবং অমরপুরে গারো উপজাতিগোষ্ঠীর অবস্থিতি। এরা প্রধানতঃ জুম চাষে অভ্যস্ত।

বাঁশের দেয়াল ও শনের ছাউনি দেওয়া গৃহে তারা বাস করে। এক একটি এলাকায় এরা দলবদ্ধভাবে বাস করে। গারো উপজাতিদের মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীও আছে। আবার খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীও আছে।

নৃত্য পরিচয়

কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রাকে অবলম্বন করেই ত্রিপুরার গারোদের সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবগুলো উদ্‌যাপিত হয়। কৃষিভিত্তিক নৃত্যগুলোর মধ্যে রয়েছে 'জুম নাচ' এবং 'রংচুগালা' ও 'ওয়ালা' উৎসব উপলক্ষ্যে নাচ। এছাড়া অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'আসংটাটা' উৎসব ও নৃত্য এবং শোক নৃত্য 'আজমা' ব্যতীত অন্য কোন নাচ ত্রিপুরার গারো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় না। যদিও নৃত্য ও গীত গারোদের জীবনযাত্রার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু গারোদের নৃত্য ও সঙ্গীতের সাজসজ্জা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ত্রিপুরায় যে সমস্ত গারো উপজাতি বসবাস করে তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। জীবন ধারনের ব্যয় নির্বাহের নিত্য চিন্তায় তাদের সাংস্কৃতিক চর্চা প্রায় অবরুদ্ধ। তাই গারো সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক প্রকার নৃত্যের প্রচলন থাকা সত্ত্বেও উপরে বর্ণিত তিন চার প্রকারের নৃত্য ব্যতীত ত্রিপুরায় বসবাসকারী গারো উপজাতিদের মধ্যে অন্য কোন নৃত্য দেখা যায় না।

পোষাক-পরিচ্ছদ

গারো উপজাতি মহিলারা সাধারণতঃ উর্দ্ধাঙ্গে ব্লাউজ পরে, অন্য একটি কাপড় দিয়ে নীচে কোমর থেকে পা পর্যন্ত জড়িয়ে নেয়। এর উপর একটি চাদর জড়িয়ে ডান হাতের নিচের থেকে নিয়ে গিয়ে পাশের কাঁধের উপর গিট্ বেঁধে দেয় এবং পুরুষেরা হাঁটুর উপর ধুতি পরে।

বৃন্দবাদ্য

খ্রাম, দামাদাদি ও আদুরি প্রভৃতি বৃন্দবাদ্য নৃত্যে ব্যবহৃত হয়।

চাকমা

চাক্‌মা উপজাতি সম্প্রদায়ের বসতি ছিল চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় । এই এলাকাটি মুহুরী বা মাতসুরি নদী বরাবর বিস্তৃত ছিল । স্যার এইচ-রিসলে এই ছাক্‌-ছাক্‌মা-চাকমাকে একই রূপে মূল নির্দেশ করেছেন । আবার সতীশচন্দ্র ঘোষ উল্লেখ করেছেন—'ছাকদের আচার-ব্যবহার চাকমাদের সহিত নানাস্থলে বিভিন্ন হলেও মূলতঃ সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না । এই ছাক্‌ নামটি যেন চাকমা নামেরই রূপান্তরমাত্র ।

চাকমাদের আদি নিবাস ছিল ব্রহ্মদেশ । সম্ভবতঃ তারা সেখান থেকে পশ্চিম দিকে বিতাড়িত হয়েছিল অথবা পশ্চিম উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে তাদের বাধ্য করা হয়েছিল ।

জুম চাষ উপযোগী ভূমির সন্ধানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত চাকমা উপজাতিদের কিছু অংশ ত্রিপুরার উত্তরাংশে এসে ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করে । ত্রিপুরার কৈলাশহর, অমরপুর, সাব্রুম এবং ধর্মনগর মহকুমাতে চাকমা উপজাতিদের অধিক সংখ্যায় বসবাস করতে দেখা যায় ।

জুম চাষই তাদের জীবন ধারণের অন্যতম প্রধান জীবিকা । বর্তমানে এরা স্থায়ীভাবে হাল চাষ পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করতে সচেষ্ট হয়েছে ।

চাকমা উপজাতিদের সামাজিক আইন-শৃঙ্খলা সামগ্রিকভাবে খুবই কঠোর । নেতা বা সর্দারকে বলা হয় 'দেওয়ান' । বিবাহাদি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংগঠিত হয় ।

চাকমা সম্প্রদায়ের মেয়েরা কাপড় বোনায় পটু । নিজেদের ব্যবহারের পোষক-পরিচ্ছদ নিজেরাই হাতে বুনে নেয় ।

চাকমা উপজাতিরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । এরা মৃতদেহ দাহ করে ।

চাকমা উপজাতি জনগোষ্ঠী খুবই সংস্কৃতিবান । বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব চাকমাদের সব চাইতে বড় উৎসব । বর্তমানে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের মহামুনি মেলার মত ত্রিপুরায় বৌদ্ধ বিহারে এবং চাকমা পাড়াগুলোতে বিরবাট মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে । বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ধর্মপাঠ ও আলোচনায় যোগ দিয়ে থাকেন । চাকমা মেয়েরা ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে গান গেয়ে থাকেন ।

নৃত্য পরিচয়

চাকমা উপজাতিদের প্রধান উৎসব ও নৃত্য হল 'বিজু'। প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে চকমা যুবক-যুবতীরা এই নৃত্য করে। চৈত্রের শেষ দিন থেকে এই উৎসব শুরু হয়ে ৭ দিন ধরে চলে। এই উৎসব ও নৃত্য 'মহামুনি মেলা' উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রিপুরায় চাকমা উপজাতিরা আর একটি পূজা উপলক্ষ্যে নৃত্য করে থাকে। পূজাটির নাম 'থান-মানা' পূজা। এই পূজা উপলক্ষ্যে যে নৃত্য করা হয় তাকেও 'থান মানা নৃত্য' বলা হয়। এই নৃত্যে শুধুমাত্র মহিলারাই অংশগ্রহণ করে থাকেন।

বেশভূষা

চাকমা উপজাতি সম্প্রদায়ের মেয়েরা তাদের জাতীয় পোষাক পিনন ও খাদি পরে। ছেলেরা মাথায় 'খেবং' (পাগড়ী) বাঁধে।

বৃন্দবাদ্য

নৃত্যের মধ্যে ধুদুক, ঢাক, ঢোল ও বাঁশী বাজান হয়। ইদানিংকালে হারমোনিয়ামের প্রয়োগ দেখা যায়।

মগ

ত্রিপুরায় মগ উপজাতিরা সাব্রুম, বিলোনীয়া, কৈলাশহর এবং ধর্মনগর মহকুমায় বসবাস করে।

মগ উপজাতিদের গ্রাম পরিষদের কর্তাকে বলা হয় বোনারাউগ চৌধুরী বা তহশীলদার।

মগ-রা সাধারণতঃ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী'। প্রত্যেক গ্রামেই একটা করে 'খোয়াং' বা ভগবান বুদ্ধের মন্দির আছে। এই মন্দিরের দেখাশোনা করেন একজন পুরোহিত তাঁকে বলা হয় 'সামফুরা'।

মৃতদেহ দাহ করা হয়। মৃত্যুর পরে মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

নৃত্য পরিচয়

নানা বিপর্যয়ে ত্রিপুরায় বসবাসরত মগদের নিজস্ব সংস্কৃতি প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মগ সমাজের যুবকরা সচেষ্ট হয়ে প্রায় লুপ্ত সংস্কৃতিকে তুলে

ধরার চেষ্টা করছে। ফলে এদের সংস্কৃতিতে নূতন করে জোয়ার এসেছে। যে নৃত্যগুলো হারিয়ে গিয়েছিল, তা কিছু কিছু পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

ভগবান বুদ্ধদেবের পূজা উপলক্ষ্যে মগ উপজাতিরা 'ফোরারিখো' বা বুদ্ধদেবের বন্দনা নৃত্য করে। কল্পতরু উৎসব উপলক্ষ্যে 'পেদেসা' বা 'পেঃসেয়ে আকা' মেগ ভাষায় নৃত্যকে আকা বলা হয়) বা নৃত্য করা হয়। এছাড়া যুবক-যুবতীরা নিছক আনন্দ বিনোদনের জন্য ধাঁধা, প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে নৃত্য করে। এই নৃত্যকে 'বিয়াসা' বলে। এদের মধ্যে আরও একটি নৃত্যের প্রচলন আছে। নৃত্যটির নাম 'পঙ্খু আকা'। অতীতে মগ মহারাজার সামনে এই নৃত্য পরিবেশন করা হত। বর্তমানে সামাজিক অনুষ্ঠানে এই নৃত্যটি প্রদর্শন করা হয়।

এছাড়া ইদানিংকালে বৌদ্ধ জাতক কাহিনীগুলি নিয়ে যাত্রার প্রচলন দেখা যায় এবং কগিয়া বা কবিগানও করা হয়।

পোষাক-পরিচ্ছদ

নৃত্যের সময় অন্যান্য উপজাতিদের মত মগরা তাদের জাতীয় পোষাক পরে। ত্রিপুরী উপজাতি মেয়েদের মতই মগ উপজাতি মেয়েরা 'রিয়াগনাই' এর মত কোমর থেকে পা পর্যন্ত পোষাক পরে। এর নাম 'খুবই'। উর্দ্ধাঙ্গে ব্লাউজ পরে। ছেলেরা 'খইয়ক' বা ধুতি পরে এবং সার্ট বা রাংজি পরে। ছেলেরা মাথায় একটি চাঁদর বেঁধে নৃত্য করে। এই চাদরটিকে বলা হয় 'বোদাংরুমা'। চাদরটিকে যখন মাথায় পাগড়ীর আকারে বাঁধা হয়, তখন এই পাগড়ীকে বলা হয় 'গংবং'। (গং—মাথা, বং—পাগড়ী)। মেয়েদের গলার মালাকে 'হইস্রংসি' বলে।

বৃন্দবাদ্য

মগ উপজাতিরা নৃত্যের সময় জোড়া ঢোল (যাকে ওদের ভাষায় 'ডুং আর আগা' বলে) ব্যবহার করে এবং উলুংব্রি বা বাঁশের বাঁশী ব্যবহার করে। ইদানিংকালে হারমোনিয়াম ও ক্ল্যারিওনেটের ব্যবহার সব নৃত্যের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

মিজো

মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর কুকি-চীন শাখার অন্তর্ভুক্ত মিজো কুকি সম্প্রদায় মূলতঃ একই সম্প্রদায়ের। লুসাই পাহাড়ের নাম ১৯৬৬ সালে মিজো পাহাড় হিসেবে পরিচিত হয় এবং এই পাহাড়ের অধিবাসীদেরকেও 'মিজো' নামে অভিহিত করা হয়।

ত্রিপুরায় জম্পুই পর্বত এলাকায় মিজো উপজাতিরা বসবাস করে। তাদের বাসগৃহ জমি থেকে ২ ফুট উঁচুতে নির্মিত এবং কাঠের দেওয়াল ও ছাদযুক্ত।

জুমচাষ এবং শিকার মিজো উপজাতিদের জাতীয় বৃত্তি। এখন তারা কমলালেবুও চাষ করছে।

মিজো নারীদের তাঁতে কাপড় বোনায় এবং সূচীশিল্পে দক্ষতা আছে।

গত কয়েক দশক থেকেই মিজো উপজাতিরা খ্রীষ্টধর্ম দীক্ষিত। এদের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই উপজাতীয় ধর্মাচার এবং হিন্দুমূর্তি পূজার প্রচলন নেই।

এই মিজো উপজাতিরা অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয়–সম্বর্দ্ধনা থেকে শোকসভায় সর্বত্রই এরা সঙ্গীত ও নৃত্যের আয়োজন করে থাকে। রাত্রিতে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তাদের পাড়ার কোন স্থানে সমবেত হয়ে নৃত্য ও সঙ্গীত অনুষ্ঠান করে।

নৃত্য পরিচয়

মিজো উপজাতিদের প্রধান নৃত্য 'চেরোলাম' বা 'চেরো'। 'চে'-পদ সঞ্চালন (Step) 'রো'–বাঁশ, 'লাম'–নৃত্য–অর্থাৎ বংশ নৃত্য। এই নৃত্যটি শুধু মেয়েদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্যস্থলের চারটে কোনে দুজন করে যুবক-যুবতী বাঁশের খুঁটি নিয়ে দ্বিমাত্রিক অথবা চতুর্মাত্রিক ছন্দে দুটো বাঁশের সাথে অপর দুটো বাঁশ ঠুকে ৪ জন অথবা ৬ জন যুবতী বাঁশ ঠোকাঠুকির ফাঁকে পা ফেলে অপূর্ব ভঙ্গিমায় নৃত্য করে। সময় এবং ছন্দের গতি লক্ষ্য করে এই নৃত্য করতে হয়।

এছাড়া এদের মধ্যে প্রচলিত নৃত্যগুলো যথা–(১) খোয়াল্লাম, (২) সার-লাম-কাই (৩) ছেইলাম।

'খোয়াল্লাম' নৃত্যটি হচ্ছে একটি আবাহনমূলক নাচ (Welcome dance) এই নৃত্যটিতে যুবক-যুবতীরা পিঠের উপর দিয়ে বড় একটি চাদর দিয়ে, সেই চাদরটি সামনের দিকে ধরে এক সারিতে নৃত্যস্থলে প্রবেশ করে নৃত্যটি করে।

সারলামকাই–'সার'-হত্যা (Unnatural death) 'লাম'-নাচ, 'কাই'-ধিক্কার। শত্রুর মস্তক শিকার করার পর সেই আনন্দে বিজয় নৃত্য করা এবং নিহত শত্রুর প্রতি ধিক্কার দেওয়া। ১৪ জন করে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ২৮ জন যুবক-যুবতী এই 'সারলাম কাই' নৃত্যটিতে অংশ নিয়ে থাকে।

'ছেইলাম' নৃত্যটি পূর্বে রাজার সামনে করা হত। এখন যুবক-যুবতীরা যে কোন আনন্দানুষ্ঠানে নৃত্যটি করে। নৃত্যের সময় মাঝে মাঝে 'ছেই' শব্দ করা হয়। 'লাম'

অর্থাৎ নাচ। নৃত্যটি রাজার সামনে করার সময় মুখ দিয়ে আনন্দের একটি ধ্বনি বের করে নাচা হত। ধ্বনিটি হচ্ছে 'ছেই' অনুরূপ পদ্ধতি পুরুলিয়ার 'ছৌ' নাচেও দেখা যায়। সেখানে ঢোলক বাদক বাজনার সঙ্গে চীৎকার করে 'ছৌ' শব্দটি উচ্চারণ করে।

পোষাক-পরিচ্ছদ

মিজো যুবক-যুবতীরা নৃত্যের সময়েও তাদের চিরাচরিত পোষাক পরে। মেয়েরা বড় হাতার ব্লাউজ পরে তার উপর কোমর থেকে পা পর্যন্ত বড় চাদর পরিধান করে এবং ছেলেদের উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত থাকে এবং কোমরে একটা বড় চাদর পরে। নাচের সময় মেয়েরা কাগজ ও পিচবোর্ড দিয়ে তৈরী একটা মুকুট মাথায় ব্যবহার করে।

বৃন্দবাদ্য

মিজো উপজাতিদের নাচে ব্যবহৃত বৃন্দবাদ্য হচ্ছে যথাক্রমে 'দারবু' (বেল), 'খোয়াম' (ড্রাম), ফেই, টিংটং (গীটার) ও দার খোয়াং (Big-gong)।

কুকি

কুকি উপজাতিদের আদি নিবাস মিজো পাহাড়। জুম চাষোপযোগী জমির সন্ধানে তারা একস্থান হতে অপর স্থানে বিচরণ করে। ত্রিপুরার ধর্মনগর, কৈলাশহর, অমরপুর এবং উদয়পুর মহকুমায় কুকি উপজাতিদের বসবাস করতে দেখা যায়।

তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বন্ধন খুবই প্রশংসনীয়। আভ্যন্তরীণ ও পারিবারিক বিবাদ-বিসম্বাদ খুবই বিরল ঘটনা। 'রাজা' বা সর্দার সম্প্রদায়ের প্রধান। তিনি পাড়ায় বাস করেন। বিচার বিষয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত নিতে হয় রাজাকে। ফলে রাজা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উৎপীড়ক হয়ে উঠতে পারেনা।

কুকি উপজাতি মেয়েরা তাঁত ও উন্নত ধরনের চরকায় কাপড় বোনে। কুকি সম্প্রদায়ের নারী ও পুরুষ উভয়েই 'পাছরা' ব্যবহার করে।

জুম চাষ ও শিকার তাদের প্রধান পেশা। ইদানিংকালে অন্যান্য জীবিকাতেও এরা নিয়োজিত হয়েছে। আবার কেউ কেউ সরকারী চাকরীও করছে।

সম্প্রতি বেশীরভাগ কুকি উপজাতিরা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। এর ফলে অতীতের পূজা-পার্বন, আচার-অনুষ্ঠান কোন কিছুই আর ওদের মধ্যে নেই। কিন্তু

পূজা এবং আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে নাচগুলো আছে, সেগুলো এরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আয়োজন করে থাকে।

নৃত্য পরিচয়

কুকি উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত নৃত্যগুলোর নাম যথাক্রমে (১) তাংডাম নৃত্য (২) থাইডর নৃত্য (৩) দারলাম নৃত্য।

তাংডাম নৃত্য শুধু মেয়েদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি মেয়ে একে অন্যের পিছনে হাত নিয়ে, অপরের হাত ধরে নৃত্যটি করে। তাংডাম পূজার পর নৃত্যটি করা হত।

থাইডর নৃত্য পারলৌকিক ক্রিয়া উপলক্ষ্যে করা হত। প্রথমে একটি ছেলে মেয়ের সাজে সজ্জিত হয়ে নৃত্যটি করে চলে যায়। এরপর অপর একটি ছেলে দা নিয়ে কিছুক্ষণ নৃত্যটি করে এর সমাপ্তি ঘটায়।

দারলাম নাচটি অস্ত্রশিক্ষা সমাপনান্তে করা হয়। দুজন ছেলে ঢাল নিয়ে নানারকম ভঙ্গী করে নাচটি করে। কিন্তু বর্তমানে নাচটি যখন প্রদর্শন করা হয় তখন ঢালের বদলে পাখা নিয়ে নৃত্যটি করে।

বৃন্দবাদ্য

এদের নাচে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সেগুলো হচ্ছে যথা–দারখুং (বড় পিতলের বেল), খুম্ (ঢোলক), জলপান (মুখের সামনে রেখে যে বাঁশী বাজান হয়), ওয়াইর বিল (মুখের পাশে রেখে যে বাঁশী বাজান হয়) এবং দারপোং (ছোট কাসির মত)।

দারলং

দারলং উপজাতিরা কুকি উপজাতিদেরই একটি প্রশাখা। দারলং উপজাতিদের মধ্যে বেশ কিছু নৃত্য চর্চিত হয়। উত্তর ত্রিপুরার দারচই ও বেতছড়া এই দুই গ্রামে দারলং উপজাতিরা বাস করে। এদের সকলেই খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী। তবুও এদের জুম চাষভিত্তিক জীবনকে অঙ্গ করেই নাচগুলো গড়ে উঠেছে।

নৃত্য পরিচয়

প্রধান নৃত্য হচেছ জ্যাঠ লুয়াং (Zat luang)। যে কোন উৎসবের পূর্বে এই নৃত্যটি করা হয়। নৃত্যটির কতকগুলো পদ্ধতি আছে। এই নৃত্যটি কয়েকটি পর্যায়

বা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত । একটি ভঙ্গী থেকে অপর একটি ভঙ্গীতে যখনই পরিবর্তিত হচ্ছে, তখনই একটি নূতন নাম দেওয়া হচ্ছে । একথা বলা চলে যে নামগুলোর অর্থ অনুসারেই ভঙ্গীগুলো করা হচ্ছে । এই প্যাটার্ন বা পর্যায়গুলোর নাম যথাক্রমে (১) জ্যাঠলুয়াং, (২) পুয়ালবাচাং হেম (৩) রিকিফচয় (৪) সাতেতুয়ালইনক্রাই (৫) আরতেতুয়ালফিত (৬) বাঠুইনদি (৭) ফনসিক্ইনসুই । এই নৃত্যগুলোতে শুধু মেয়েরা অংশগ্রহণ করে থাকে ।

এছাড়া আরও কয়েকটি নাচ আছে । যথা—(১) লামপালাক্ (২) খুয়াল্লাম (৩) ভৈ-মৈ । এই নাচগুলো ছেলেদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় ।

পোষাক-পরিচ্ছদ

এই সম্প্রদায়ের মেয়েরা কটিদেশে চাদরের মত একটি কাপড় জড়ায় । এর নাম 'পুয়ানদুম' । দেহের উর্দ্ধভাগে ব্লাউজ পরে এবং একটি চাদর আড়াআড়িভাবে বক্ষ্যের সামনে কোমরের একপাশে বেঁধে ঝুলিয়ে দেয় । একে বলে 'জেমফাল' । নৃত্যের সময় পশু-পাখীর পালক দিয়ে তৈরী বৃত্তাকার রিঙের মত, মাথায় পরিধান করে । এর নাম 'লুথিম' । গলার মালাকে 'রিথেই' বলে এবং কানে বাঁশের তৈরী বড় রিং পরে তাকে বলে 'ফুয়ার বে' ।

বৃন্দবাদ্য

এদের নাচে যে সমস্ত বৃন্দবাদ্য ব্যবহৃত হয় সেগুলোর নাম—(১) বসেম (২) দারতেং (৩) দারখোয়াং (এই যন্ত্রটি কারুর মৃত্যু হলে পর বাজান হয়) (৪) তুইথেম (৫) খুয়াং (ছোট ড্রাম) ।

চাইমল

চাইমল উপজাতি সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে কুকি উপজাতি সম্প্রদায়ের একটি শাখা । কুকিদের মতই তাদের প্রধান উপজীবিকা ।

ত্রিপুরাতে এদের সংখ্যা এত অল্প যে ১৯৬১ সালের জনগণনার রিপোর্টে চাইমল সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে না দেখিয়ে কুকি উপজাতিদের সাথে মিশিয়ে দেখান হয়েছে ।

এই সংখ্যাল্পতার জন্য ত্রিপুরাতে চাইমল উপজাতিদের কোন নৃত্য-গীত দেখা যায় না ।

উত্তর পূর্ব ভারতের অন্যান্য প্রদেশের উপজাতি

খাসিয়া

অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত খাসিয়া উপজাতি সম্প্রদায় বর্তমান মেঘালয় রাজ্যে খাসিয়া, জয়ন্তীয়া পাহাড়ের আদিম মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এদের ভাষা মন-ক্ষের (Mon-Kher) গোষ্ঠীভুক্ত।

জুম হচ্ছে খাসিয়া উপজাতিদের প্রধান জীবিকা। জুমের মাধ্যমে তারা প্রধান খাদ্য-শস্য উৎপাদন করে থাকে।

উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহরের দাতুছড়া গ্রামে খাসিয়া উপজাতিদের বসতি। ত্রিপুরাতে খাসিয়া উপজাতিদের সংখ্যা খবুই কম। যদিও এরা ত্রিপুরাতে কয়েক পুরুষ ধরেই বসবাস করছে।

ত্রিপুরাতে খাসিয়া উপজাতিরা জুমে পানের বরোজ (চাষ) করে জীবিকা নির্বাহ করে। এখানে খাসিয়ারা তিনপুরুষ ধরেই খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করছে এবং সামান্য কিছু বৌদ্ধধর্মাবলম্বীও আছেন। সামাজিক বিপর্যয়েই হোক আর অর্থনৈতিক কারণেই হোক, ত্রিপুরার খাসিয়া উপজাতিদের নিজেদের সংস্কৃতি বলতে কিছুই নেই। মেঘালয় রাজ্যে বসবাসরত খাসিয়া উপজাতিদের মধ্যে চর্চিত বিখ্যাত 'নংক্রেম' নৃত্যটি এদের মধ্যে অনুপস্থিত।

ইদানিংকালে এই খাসিয়া উপজাতিরা অন্যান্য উপজাতিদের সংস্কৃতিতে উৎসাহিত হয়ে নিজেদের কোন কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে সেই নৃত্যটি উপস্থাপনা করে। এই নৃত্যটির নাম 'পাস্-তি-এ'। শুধুমাত্র পুরুষেরাই নৃত্যটিতে অংশগ্রহণ করে।

পোষক-পরিচ্ছদ

নৃত্যের সময় এক ফালি কাপড় কোমরে জড়িয়ে একটি গামছা তার উপর বেঁধে সামনে ঝুলিয়ে দেয়।

বৃন্দবাদ্য

নৃত্যের সময় শুধুমাত্র ঢোল বাজে।

ভুটিয়া

ভুটিয়া উপজাতি জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। স্বাস্থ্যবান, ফর্সা, চেপ্টা মুখমণ্ডল, ছোট চোখ ও নাক এদের দৈহিক গঠনের বিশেষত্ব। শীত প্রধান অঞ্চলে বসবাস করে বলে পশমের ঢিলে পোষাক এদের প্রধান গাত্রবরণ। ভুটিয়া উপজাতিরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং লামা সম্প্রদায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনা করে থাকেন।

মূলতঃ ভুটান রাজ্য এবং সিকিমে ভুটিয়াদের বসবাস। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে গরম পোষাকের ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে কিছু কিছু ভুটিয়ার আগমন হয়।

ত্রিপুরাতে এদের সংখ্যা এত নগণ্য যে, কোন সংস্কৃতিই এদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

লেপচা

উত্তর পূর্ব সীমান্তে উপজাতিদের মধ্যে অন্যতম হল লেপচা উপজাতি জনগোষ্ঠী। এরাও মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

জুম চাষ লেপচা উপজাতিদের প্রধান জীবিকা। এরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

লেপচা উপজাতি ত্রিপুরায় খুব সামন্য সংখ্যক বসবাস করে। ফলে এদের মধ্যে কোন নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান দেখা যায় না।

মধ্যভারতের উপজাতি

সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, ভীল এই চারটি উপজাতি সম্প্রদায় মূলতঃ মধ্যভারতের উপজাতি জনগোষ্ঠী। ভারতের বৃটিশ রাজত্বের সময়ে সিলেট এবং পার্বত্য ত্রিপুরায় কিছু চা-বাগানের পত্তন হয়। বৃটিশ চা-বাগান মালিকরা তৎকালীন ছোট নাগপুর ডিভিশন থেকে ভীল, মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের এখানে নিয়ে আসে। ত্রিপুরায় সদর, খোয়াই, কমলপুর, কৈলাশহর ও ধর্মনগর মহকুমায় এ সমস্ত বহিরাগত উপজাতি সম্প্রদায় চা-বাগানগুলিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করে।

সাঁওতাল, ভীল, ওঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতিরা প্রায় দুশো বছর ধরে ত্রিপুরায় বসবাস করার ফলে এখন এই রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। শুধু চা-বাগিচাই নয়, এ সম্প্রদায়ের উপজাতিরা বর্তমানে কৃষিকাজ এবং অন্যান্য জীবিকায় অংশগ্রহণ করছে।

সাঁওতাল

সাঁওতালদের নিজস্ব সামজিক রীতিনীতি রয়েছে। ত্রিপুরার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সর্দার প্রথা বর্তমান। ৪৮টি সাঁওতাল পাড়ার সর্দারদের নিয়ে একটি মণ্ডল গঠিত হয়েছে, যা তাদের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে।

গাঢ় বাদামী রঙের শক্ত-সমর্থ মাঝারী উচ্চতা বিশিষ্ট সাঁওতাল জনগোষ্ঠী শিকার প্রিয় বলে পরিচিত। কৃষি সাঁওতালদের প্রধান জীবিকা। এছাড়া শিকার, মৎস চাষ তাদের অন্যতম জীবিকা নির্বাহের পথ।

অষ্ট্রিক পরিবারভুক্ত এই জনগোষ্ঠী শিল্প সংস্কৃতির চর্চায় প্রচণ্ড উৎসাহী। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন কৃষি জীবনযাত্রার উপর নির্ভর। বসন্ত উৎসব বা বাহা উৎসব থেকে সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। সাঁওতাল যুবতীরা বাড়ীর উঠোনের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের কোমরে হাত দিয়ে সঙ্গীতের তালে একটি বিশেষ ছন্দে ধীর লয়ে নৃত্য করে থাকে। পুরুষরা মাদল, বাঁশী ও ষাঁড়ের শিংয়ের শিঙ্গা বাজিয়ে সঙ্গীত রচনা করে। সাঁওতাল উপজাতিদের শৈল্পিক সুষমা উল্লেখ-যোগ্য। এদের গৃহগুলি নানা চিত্রকলায় সজ্জিত থাকে।

ত্রিপুরায় যে সমস্ত সাঁওতাল উপজাতিদের বসবাস, জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে তাদের জীবন ধারনের চিরাচরিত অভ্যাসগুলো অনেক পাল্টে গেছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে দুঃখ-দুর্দ্দশার দরুন তাদের মধ্যে উৎসব ও সংস্কৃতি চর্চা অনেক কমে গেছে। এখন শুধু এরা বিবাহাদি উপলক্ষ্যে 'দাঁ-বাপ্‌লা' নৃত্য করে। এছাড়া এই সাঁওতাল উপজাতিরা 'বাহা' উৎসব ও নৃত্য এবং জমিকে কেন্দ্র করে 'সারহাই' উৎসব ও নৃত্য করে। এই নৃত্যগুলোতে মেয়েরাই অংশগ্রহণ করে।

বেশ-ভূষা

সাঁওতাল মেয়েরা নাচের সময়েও তাদের নিজস্ব পোষাক শাড়ী হাঁটুর উপরে তুলে পরে। চুল টেনে পিছনে খোঁপা বেঁধে তাতে ফুল গুঁজে দেয়।

বৃন্দবাদ্য

নাচের সঙ্গে যে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় তা হল নাকাড়া (টিকারা), তিরিও (বাঁশী) ইত্যাদি।

ভীল

মধ্য ও পশ্চিম ভারত জুড়ে ভীল সম্প্রদায় ছড়িয়ে আছে। কৃষি ভীলদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। মৎস চাষ এদের অন্যতম প্রধান সহায়ক জীবিকা। ভীল উপজাতিরাও শিকার প্রিয়।

ত্রিপুরার চা-বাগানগুলোতে শ্রমিক হিসাবে কিছু ভীল উপজাতি কাজ করে, যাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাই এখানে সংখ্যাল্পতার জন্য সাংস্কৃতির চর্চ্চা অত্যন্ত সীমিত। হরিণ বা অন্য কিছু শিকারকে অবলম্বন করে একটি নৃত্য করার প্রয়াস এদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু তা এতই দুর্বল যে একে ঠিক নৃত্য বলেও আখ্যা দেওয়া যায় না। এতে পুরুষেরাই অংশগ্রহণ করে।

ওঁরাও

ওঁরাও উপজাতি জনগোষ্ঠী অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ত্রিপুরায় সদর, খোয়াই, কমলপুর, ধর্মনগর, কৈলাশহর চা-বাগানগুলোতে ওঁরাও উপজাতিদের চা-শ্রমিক হিসাবেকাজ করতে দেখা যায়।

মূলতঃ কৃষিভিত্তিক এদের জীবন। এছাড়া শিকার, মৎসচাষ, ফল সংগ্রহ ইত্যাদি এদের সহায়ক জীবিকা।

ত্রিপুরাতে বসবাসকারী ওঁরাওদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। আর্থিক অনটনের দরুন এদের মধ্যে বিভিন্ন উৎসবগুলো প্রায় হন না বললেই চলে। তবুও এই অপরিসীম দারিদ্রতার মধ্যে এক, দুটো অনুষ্ঠান করে থাকে। উৎসবকে ভিত্তি করেই নাচগুলো প্রচলিত। ত্রিপুরার ওঁরাও উপজাতিদের প্রধান উৎসব করম পূজা। এই পূজার নামেই নৃত্যটির নাম 'করম নাচ' বা 'কর্মা' নৃত্য।

এছাড়া এরা ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমার দিন দোল পূজা করে। এইদিন ওরা 'ফাগুয়া' নাচ করে। সারাদিন রঙ খেলার পর রাত্রিতে চাঁদের আলোয় ছেলে ও মেয়েরা মিলে এই ফাগুয়া নাচটি করে। এই নৃত্যটি হাতে কাঠি নিয়ে করা হয়। এই করম এবং ফাগুয়া নাচ ছাড়াও ওঁরাও উপজাতিরা ঝুমুর নাচও করে থাকে। প্রতিটি নাচেই ছেলে-মেয়ে উভয়েই যোগদান করে।

বেশভূষা

মেয়েরা হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরে কোমরে আঁটোসাটো করে আঁচল জড়িয়ে রাখে এবং পুরুষরা ধুতি ও পাগড়ীর ব্যবহার করে।

বৃন্দবাদ্য

নাচগুলির সঙ্গে ঢোল ও বড়-করতাল ব্যবহার করা হয়।

মুণ্ডা

মুণ্ডা উপজাতি জনগোষ্ঠী বিন্ধ্য পর্বতমালার কোল সম্প্রদায় থেকে সৃষ্ট বলে ঐতিহাসিকদের অভিমত । বর্তমানে বিহারে মুণ্ডা উপজাতিদের বসবাস । সাঁওতালদের সাথে মুণ্ডাদের অনেক সাদৃশ্য আছে । মূলতঃ কৃষি তাদের জীবিকা । এরা অত্যন্ত ভাল শিকারী ।

নৃত্য পরিচয়

এদের সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা সাঁওতালদের মতই । মুণ্ডা যুবক-যুবতীরা তাদের পাড়ায় পাড়ায় নৃত্য ও সঙ্গীত অনুষ্ঠান করে থাকে । এরা সারা বছর তিনটি উৎসব করে থাকে । যথা–যাদুর, লাসুর ও গেনা । এই উৎসবগুলি উপলক্ষ্যে এঁরা নৃত্য করে । এছাড়া ঝুমুর নাচও ওদের মধ্যে প্রচলিত আছে । মুণ্ডা উপজাতিদের মধ্যে যাত্রা উৎসবের প্রচলন দেখা যায় ।

ত্রিপুরার চা-বাগানগুলিতে খুবই অল্পসংখ্যক মুণ্ডা পরিবার বসবাস করে । দারিদ্র্যের নিপীড়নে জীবন নির্বাহ করাটাই তাদের কাছে কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে । নৃত্য-গীতাদির ক্ষীণ প্রবাহ এদের মধ্যে কোন প্রকারে টিঁকে আছে ।

যাদুর, লাসুর ও গেনা এই নাচগুলি চর্চ্চার অভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে শুধু ঝুমুর নাচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে । তবে যাত্রার প্রচলন ত্রিপুরায় বসবাসকারী মুণ্ডা উপজাতিদের মধ্যে কিছু কিছু আছে ।

ঝুমুর নাচটি মুণ্ডা উপজাতি মেয়েরা করে । নাচটির সঙ্গে একজন পুরুষ গান করে ও একজন পুরুষ নাচটির সঙ্গে ঢোল বাজায় ।

এছাড়া ত্রিপুরার মুণ্ডা উপজাতিরা দোলপূর্ণিমার রাত্রিতে শিকার করে । ত্রিপুরার বনে হরিণ ও খরগোশ ছাড়া অন্য বড় জন্তু নেই । ওরা হরিণ ও খরগোশ শিকার করে এবং এই শিকারকে কেন্দ্র করেই একটি নৃত্যানুষ্ঠান করে । এই নৃত্যের উপস্থাপনাও খুবই দুর্বল আকারের ।

বেশভূষা

ত্রিপুরার মুণ্ডা উপজাতি মেয়েরা শাড়ী পরে এবং পুরুষেরা ধুতি ও মাথায় পাগড়ী বাঁধে ।

বৃন্দবাদ্য

এদের নাচগুলিতে ঢোলকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ।

ত্রিপুরার উপজাতি ও নৃত্য পরিচয় দিতে গিয়ে ৩টি প্রশাখা (Sub-Tribe) উপজাতির নৃত্যের কথা এখানে উল্লেখ না করলে ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্য পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই তিনটি প্রশাখা হল হালাম সম্প্রদায়ের উপশাখা কলই, রূপিনী এবং মরশুম।

রূপিনী

রূপিনী সম্প্রদায় হালাম উপজাতিদের একটি প্রশাখা। যদিও কক্‌বরক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এরা খুবই নৃত্য-গীত প্রিয় উপজাতি।

নৃত্য পরিচয়

রূপিনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কের পূজার নাচ, গড়িয়া নাচ ও জুম নাচ প্রচলিত। গড়িয়া নাচই ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। জুম নাচ যদিও ওরা করে, তবু জুম নাচের প্রচলন খুব বেশী নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কের পূজা উপলক্ষ্যে নৃত্য রূপিনী উপজাতি ব্যতীত অন্য কোন উপজাতিদের মধ্যে দেখা যায় না। তবে কের পূজা পূর্বের মত সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় না। তাই নৃত্যটির প্রচলনও ততটা নেই। মাঝে মাঝে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ওরা নৃত্যটি পরিবেশন করে। রূপিনী সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু মেয়েরাই নৃত্য করে। একজন পুরুষ 'অচাই'-এর ভূমিকায় থেকে নৃত্যের ছন্দে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করে এবং মাঝে মাঝে চীৎকার করে নির্দেশ দেয়।

বেশভূষা

মেয়েরা চিরাচরিত পোষাক 'রিগনাই' ও 'রিসা' পরে। অন্যান্য উপজাতি মেয়েদের এই রূপিনী সম্প্রদায়ের মেয়েরাও পুষ্প প্রিয়। নৃত্যের সময় এরা খোঁপায় প্রচুর ফুলের মালা ব্যবহার করে।

বাদ্যযন্ত্র

এদের নৃত্যে খাম্, সুমু (বাঁশী) বাজান হয়।

কলই

হালাম সম্প্রদায়ের অপর একটি প্রশাখা হল কলই উপজাতি। এরাও কক্‌বরক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

এদের মধ্যেও গড়িয়া উৎসব উপলক্ষ্যে গড়িয়া নাচ সর্বাধিক প্রচলিত। ত্রিপুরায় কোন কোন স্থানের কলই উপজাতিদের মধ্যে শুধু ছেলেরাই এই নৃত্যটি করে (যেমন—অমরপুর মহকুমা অন্তর্গত বৈশ্যমুনি পাড়ার কলই সম্প্রদায়) এবং কোথাও আবার ছেলেমেয়ে উলয়ে মিলেই এই নৃত্যটি করে (যেমন তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত উত্তর গোকুল নগরের ব্রহ্মছড়া গ্রামের কলই সম্প্রদায়)।

এই কলই উপজাতিরা জুম নাচও করে। তবে এই জুম নাচটি খুব বেশী প্রচলিত নয়। ত্রিপুরার কোন কোন কলই সম্প্রদায়েরা (যেমন—পশ্চিম ত্রিপুরার জম্পুইজলার দারকাই কলই বাড়ী) প্রথমে জুম নাচ করে এরপর গড়িয়া নাচটি করে।

বেশভূষা

মেয়েরা 'রিগনাই তা খমচাই' ও 'রিসাতাই খমচাই' পরে এবং ছেলেরা ধুতি পরে।

বৃন্দবাদ্য

এদের নৃত্যে শুধু খামবাদ্য ও সুমু (বাঁশী) ব্যবহার করা হয়।

মলশুম

হালাম উপজাতিদের মধ্যে অন্যতম প্রশাখা হচ্ছে মলশুম উপজাতি। এই মলশুম উপজাতি ত্রিপুরা জেলায় বেশ কয়েকটি জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

নৃত্য পরিচয়

এদের মধ্যে একমাত্র জুম নাচই প্রচলিত। ছেলেমেয়ে উভয়েই এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করে।

এই মলশুম উপজাতিদের একটি গোষ্ঠী অমরপুরের তৈজলং বাড়ীতে বসবাস করে। তাদের মধ্যে মমিতা পূজা উপলক্ষ্যে 'ডলইলাম' বা ডালা নিয়ে নৃত্যের প্রচলন আছে। একটি যুবক এই নৃত্যটি প্রদর্শন করে।

বেশভূষা

মেয়েরা 'পনজেল' (পাছড়া) ও রিসা ব্যবহার করে এবং ছেলেরা ধুতি পরে এবং মাথায় 'লুকোম' (পাগড়ী) বাঁধে।

বৃন্দবাদ্য

মলশুম নৃত্যে ব্যবহৃত যন্ত্র যথাক্রমে—খাং (খামবাদ্য) সারিন্দা ও সুকমুল (বাঁশী)।

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্যগুলো নিয়ে আলোচনার প্রারম্ভে ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্যগুলোর একটি তালিকা এবং ত্রিপুরার প্রতিনিধিস্থানীয় উপজাতীয় নৃত্যগুলির অঞ্চলভিত্তিক ও বিষয়বস্তুভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ করে নিম্নে প্রদত্ত হল।

ত্রিপুরার উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে যে নাচগুলো প্রচলিত আছে, সেগুলো হল–

উপজাতী	নৃত্য
১) ত্রিপুরী	জুম, গড়িয়া, লেবাংবুমানি, মসকসুরমানি, মামিতাহরাইমানি, মামিতা ওয়া মুসামো
২) রিয়াং	লুকতাংমা (জুম), খামচই মাইমি, সামফ্লিংবাচামি, কুথৈনাইস, তায়ৌখাম্মি, লাম্চাক্মি, নোকসারখেমি এবং হজাগিরি বা মাইখুলুং মৌমামুং
৩) উছই	হজাগিরি
৪) জমাতিয়া	গড়িয়া
৫) নোয়াতিয়া	জুম, গড়িয়া
৬) হালাম	জুম, সাপিতেদয় (ভায়লাম, আরমনআনুচ ও সাপিতেলা)
৭) চাকমা	বিজু, যানমনা
৮) মগ	ফোরারিখো, পেদেসা, বিয়াসা, পঙ্খুআঁকা
৯) ওঁরাও	করম, ফাগুয়া, ঝুমুর
১০) মুণ্ডা	ঝুমুর
১১) সাঁওতাল	দাঁ-বাপলা, বাহা
১২) খাসিয়া	পাস্-তি-এ
১৩) মিজো	চেরো, খোয়াল্লাম, সারলামকাই, ছেইলাম
১৪) কুকী	তাংডাম, থাইডর এবং দারলাম
১৫) দারলং (কুকীদের প্রশাখা)	জ্যাঠলুয়াং (পুয়ালবাচাংহেম, রিকিফচয়, সাতেতুয়াল ইনক্লাই, আরতেতুয়াল-ফিড, বাঠুইনদি, ফনসিকইনসুই) লামপালাক্, খুয়াল্লাম, ভৈমি
১৬) গারো	জুম, রাংচুগালা, ওয়াংলা, গ্রাতুলি ও মাংরিয়া
হালামদের প্রশাখা	
১৭) কলই	গড়িয়া
১৮) মলশুম	জুম
১৯) রূপিনী	কের, গড়িয়া

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিনিধস্থানীয় উপজাতীয় নৃত্যগুলির বিষয়বস্তু ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ নিম্নে প্রদত্ত হল

উপজাতি	সামাজিক বা উৎসব কেন্দ্রিক নাচ	কৃষিভিত্তিক নাচ	শিকারভিত্তিক নাচ	পশুপক্ষীর অনুকরণমূলক নাচ	আচার-অনুষ্ঠানমূলক নাচ (কামনা পূরণমূলক নাচ)	ধর্ম ও দেবতা কেন্দ্রিক নাচ	যুদ্ধমূলক নাচ
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ত্রিপুরী	গড়িয়া	ক) জুম (কৃষি বপন, উৎপাদন ও ঘরে আনয়ন খ) লেবাঙ্গবু-মানি	মশক সুমানি	ক) গড়িয়া (পশুপক্ষীর গতিভঙ্গী অনুকরণ করে নাচ খ) মামিতা ওয়া মুসামো (পশুপক্ষীর গতি ভঙ্গীর অনুসরণ করে নাচ)	ক) মামিতা খ) মামিতা ওয়া মুসামো (বাঁশ নিয়ে নাচ) গ) জুম (কৃষির স্থান নির্বাচনের আচার-অনুষ্ঠান) ঘ) গড়িয়া নৃত্যের পূর্বে আচার-অনুষ্ঠান	গড়িয়া (প্রতীক পূজা বাঁশ)	--

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জমাতিয়া	গড়িয়া (সামাজিক-রাজনৈতিক	--	--	--	গড়িয়া (প্রতীক বাঁশ নির্বাচনের কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠানের আশ্রয় নেওয়া হয়	গড়িয়া মূর্ত্তির শুধুমাত্র মাথা পূজা,	--
নোয়াতিয়া	গড়িয়া	জুম	--	--	গড়িয়া	--	--
রিয়াং	হজাগিরি (বিবাহ অথবা নবান্ন ইত্যাদি আনন্দানুষ্ঠানের নাচ	--	--	--	ক) সামুংমাইমি উৎসবে খামচই মাইমি নাচ (সম্পন্ন চাষীর শ্রীবৃবি কামনা) খ) সামক্রিং বাচামি গ) কুথৈনাইম ঘ) তায়ীখামমি ঙ) লামচাকমি চ) নোকসারখেমি	-- মৃতের প্রতি শোক ও শ্রদ্ধা নিবেদনের নাচ	--
উছই	--	--	--	--	--	--	--
সাঁওতাল	ক) দাঁ-বাপলা (বিবাহ-অনুষ্ঠানের নাচ)	--	--	--	--	--	--

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
চাকমা	বিজু	--	--	--	থানমনা	--	--
মগ	ক) বিয়াসা (যুবক-যুবতীদের আমোদ-প্রমোদের নাচ) খ) পঙ্খুআঁকা (মনো-রঞ্জনমূলক নাচ)	--	--	--	ক) ক্রোরারিমো (বুদ্ধ-দেবের নিকট সমৃদ্ধি কামনা খ) পেসেঃ য়ে বা পেদেসা আকা (কল্পতরু বুদ্ধদেবের নিকট পরজন্মের সমৃদ্ধি কামনা)	--	--
গারো	ক) রাংচুগালা খ) ওয়াংশলা গ) ১। গ্রিকা নবান্ন (ওঝারে নাচ উৎসব ২। গুড়িরুনুয়া ৩। দানিদখনুয়া	জুম	--	--	ক) ওয়াংলা খ) গ্রাতুলি (যাদু বিশ্বাস মূলক নাচ) গ) সাংরিয়া (শোক প্রকাশক নাচ)	--	--
খাসিয়া	--	--	--	--	পাস-তি-এ (অশুভ শক্তি থেকে রক্ষা করা)	--	--

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ওঁরাও	ফাগুয়া	--	--	--	করম	--	--
মুণ্ডা	ঝুমুর	--	--	--	--	--	--
দারলং	জ্যাঠলুয়াং	--	--	ক) পোয়াল-বাচাংহেম খ) রিকিফচয় গ) সা তেতু-য়াল ইনক্লাই ঘ) আরতেতু-য়ালফিত ঙ) বাঠুইনদি চ) লামপালাক	--	--	ফনসিক-ইনসুই
হালাম	--	জুম	--	আরথন আনচু	সাপিতেলা	--	--
মলশুম	--	জুম	--	--	--	--	--
কলই	গড়িয়া	--	--	গড়িয়া	--	--	--
রূপিনী	গড়িয়া	--	--	গড়িয়া	--	কের পূজা	--
কুকি	তাংডাম	--	--	--	থাইডর	--	দারলাম

উপজাতীয় নৃত্যে তিনটি জীবিকাভিত্তিক (শিকারভিত্তিক, পশুপালকভিত্তিক, কৃষিভিত্তিক) জীবনযাত্রার প্রতিফলন ঘটেছে—একথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। শিকারভিত্তিক ও পশুপালকভিত্তিক জীবনের ছায়া এদের নৃত্যে কিছু কিছু দৃষ্ট হয়। বিশেষ করে ত্রিপুরার প্রধান উপজাতি ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের 'মশক সুরমানি' নৃত্যটিতে শিকারভিত্তিক জীবনের ছায়া পরিদৃষ্ট হয়। এই নৃত্যটি হরিণ শিকারকে অবলম্বন করে করা হয়। ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে একমাত্র ত্রিপুরী উপজাতি ব্যতীত অন্য কোন উপজাতিদের মধ্যে এই শিকারভিত্তিক নৃত্য দেখা যায় না।

ত্রিপুরার অধিকাংশ উপজাতি জুম কৃষিভিত্তিক জীবন-যাপন করে। উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কৃষিভিত্তিক জীবনকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে আচার-অনুষ্ঠান, আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে উৎসব। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অর্থাৎ কৃষি, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব ইত্যাদিতে অপিরহার্য অঙ্গ হচ্ছে নৃত্যকলা। যেহেতু একটির সঙ্গে অপরটির নিবিড় সম্পর্ক আছে এবং কৃষিভিত্তিক জীবন থেকেই নৃত্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, সেইহেতু কৃষিভিত্তিক নাচগুলিই পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম ও দেবতা কেন্দ্রিক এবং উৎসব কেন্দ্রিকে পরিণত হয়েছে।

কৃষিভিত্তিক নাচ
↓
আচার-অনুষ্ঠানমূলক নৃত্য ↓ ধর্ম ও দেবতাকেন্দ্রিক নৃত্য ↓ উৎসবভিত্তিক নৃত্য

ত্রিপুরার উপজাতিদের প্রধান কৃষিভিত্তিক নৃত্যগুলো নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

কৃষিভিত্তিক নাচ

১) ত্রিপুরী উপজাতি ...... জুম, লেবাঙ্গবুমানি।
২) গারো উপজাতি ...... রাংচুগালা, ওয়াংলা, গুড়ি-রুনুয়া এবং দানিদুখ্নুয়া।
৩) হালাম উপজাতি ...... জুম নাচ।
৪) মলশুম উপজাতি (হালাম উপজাতির প্রশাখা) ...... জুম নাচ।

উপরে বর্ণিত এইসব উপজাতিদের জুম নাচের বিষয়বস্তুও একই। জুমের জমি বাছাই থেকে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত জুমভিত্তিক কৃষিকার্যের প্রতিটি পর্ব এই জুম নৃত্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

তবে প্রতিটি উপজাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রকাশ ভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য আছে। নৃত্যের আঙ্গিক এবং দেহ ভঙ্গিমার মধ্যে এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়

নিম্নে উপজাতি ভেদে জুম নৃত্যগুলো আলোচনা করা হল।

১) ত্রিপুরী উপজাতিদের জুম নৃত্যের পর্ব–

(ক) হুগ রাইমানি (জুম এলাকা চিহ্নিত করা উপলক্ষ্যে নৃত্য)

(খ) হুগ তাংমানি (জুমের জঙ্গল পরিষ্কার করা)

(গ) হর সগমানি (জঙ্গলে আগুন দেওয়া)

(ঘ) মাইনিমানি (জুমের বীজ বপন করা)

(ঙ) মাইরামানি (জুমের ফসল তোলা)

ত্রিপুরার উপজাতিদের নৃত্য বর্ণনা করার সময় যেখানেই 'নাট্যশাস্ত্র' ও 'অভিনয় দর্পণের' সঙ্গে সাদৃশ্যমান, সেখানেই তা উল্লেখ করছি এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বশেষ অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা থাকবে।

১। নাট্যশাস্ত্র–ভারতের নৃত্যকলা সম্পর্কিত সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে ভরতমুনি রচিত 'নাট্য শাস্ত্র' সর্বাপেক্ষা প্রচীনতম। ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতকে। অভিনয় ও নৃত্যের উপর ব্যাপক আলোচনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। নৃত্যে প্রযুক্ত শিরোভেদ, দৃষ্টিভেদ, গ্রীবাভেদ, হস্তমুদ্রা, কটিসঞ্চালন, পদসঞ্চালন প্রভৃতি সব কিছুরই বিস্তৃত আলোচনা নাট্যশাস্ত্রে করা হয়েছে। ভারতীয় ভাস্কর্যে নৃত্যের যে বিভিন্ন ভঙ্গী রূপায়িত হয়েছে, তা নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত ভঙ্গীগুলির প্রভাবে প্রভাবিত। 'নাট্যশাস্ত্র' ভারতীয় নৃত্যের প্রামাণ্য দলিল বলে পরিচিত।

২। অভিনয় দর্পণ–অভিনয় দর্পণের রচয়িতা হলেন নন্দিকেশ্বর। অভিনয় দর্পণ গ্রন্থটি 'নন্দিকেশ্বর সংহিতা' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের পরিশিষ্ট। অভিনয় দর্পণের রচনাকাল নিয়ে বহু মতভেদ আছে। তবে ভরতমুনি রচিত 'নাট্যশাস্ত্রের' অগ্রাধিকার স্বীকার করে নিয়ে গবেষকগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে অভিনয় দর্পণ রচনার কাল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী। এই গ্রন্থটি নন্দিকেশ্বর ও তাঁর সম্প্রদায় প্রবর্তিত ধারা অভিনয়, কলা, মুদ্রা প্রভৃতি সম্পর্কে একটি মূল্যবান গ্রন্থ। বিভিন্ন অঙ্গাভিনয়ের প্রকারভেদের মধ্যে এদের পারস্পরিক সংযোজনের মাধ্যমে অনন্ত শিল্প বৈচিত্র্যের কথা নন্দিকেশ্বর বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। বহিরঙ্গের সৌন্দর্য সম্পাদনের খুঁটিনাটির উপর নন্দিকেশ্বব বিশেষ গ্রাধান্য দেখিয়েছেন। নাট্যধর্মী অভিনয়ের আলোচনায় অভিনয় দর্পণ বিশেষ মূল্যবান।

ত্রিপুরী উপজাতিদের একটি গোষ্ঠীর জুম নৃত্যের বর্ণনা দেওয়া হল।

ত্রিপুরী উপজাতিদের জুম নৃত্যের ভূমিকা

জুম নৃত্যটি শুরু করার পূর্বে চারজন যুবক এসে ঘুরে ঘুরে বাঁশ কেটে দুটো বাঁশ দুধারে পুঁতে একটা সীমানা নির্দ্ধারণ করে। অন্য একটি বাঁশ মাঝখানে চিরে দুহাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চোখ বুঁজে মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গী করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে জমির শুভ-অশুভ বিচার করার জন্য। যখন জমিটি শুভ বলে গণ্য হয় তখন যুবকরা দুহাত উপরে তুলে মুখে ও চোখে আনন্দের অভিব্যক্তি করে। (এখানে চোখের দৃষ্টিতে নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত 'আলোকিত' দৃষ্টির ব্যবহার দেখা যায়। 'আলোকিত'—হঠাৎ কোন জিনিসকে দেখতে হলে যে দৃষ্টি তাকে আলোকিত বলে।)

১ নং ভঙ্গী

মূল নৃত্য

চারজন যুবক ডান হাতে দাঁ-টি সোজাভাবে রেখে ডান পা ও বাঁ পা, যথাক্রমে পেছনে টেনে নিয়ে চার মাত্রার ছন্দে নৃত্যস্থলে আসে। (পায়ের এই ভঙ্গীটি নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত চাষগতি ভৌমিচারীর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়) পায়ের এই ভঙ্গীতেই প্রথমে ওরা একটি লম্বা সরলরেখায় নৃত্যস্থলের পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। এরপর ক্রমান্বয়ে উত্তর দিকে, দক্ষিণ দিকে এবং শেষে পশ্চিম দিকে গিয়ে পেছন দিকে পা চালনা করে পিছিয়ে আসে অর্থাৎ নৃত্যস্থলের পশ্চিম দিকে ওরা দাঁড়িয়ে পা পূর্বের মত চালনা করে পিছিয়ে নৃত্যস্থলের মাঝখানে এসে বসে। এই পদচালনা দ্বারা ওরা একটি চতুষ্কোন নক্সা তৈরী করে। এই ভঙ্গীতেই ওরা জুমের জায়গা অন্বেষণ করে।

২ নং ভঙ্গী

অভিনয় দর্পণের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

এক সারিতে বসে হাতের দাঁ ধরে মাটিতে ধার দেওয়ার ভঙ্গী করে। (এই দাঁ ধরে দেবার ভঙ্গীটি প্রত্যেক ত্রিপুরী উপজাতিরাই জুম নাচে ব্যবহার করে। এই ভঙ্গীটিতে অনেকটা 'অভিনয় দর্পণ' গ্রন্থে উল্লেখিত পার্শ্বসূচীমণ্ডলম-এর সাদৃশ্য আসে। পার্শ্বসূচীমণ্ডলম—চরণদ্বয়ের অগ্রভাগ দ্বারা এবং এক পার্শ্বে এক জানু দ্বারা ভূতল স্পর্শ করে অবস্থান করলে যেরূপ স্থিতি হয় তাকে পার্শ্বসূচীমণ্ডল বলে।

৩ নং ভঙ্গী

যুবকরা একই লম্বা সারিতে পূর্বের মত চতুষ্কোন নক্সার সৃষ্টি করে, এক হাতে জঙ্গলের আগাছা ধরার ভঙ্গী করে। অন্য হাত দিয়ে আগাছা কাটার ভঙ্গী করে নৃত্যস্থলের চারপাশে ঘুরে চলে যায়।

৪ নং ভঙ্গী

নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

চারজন যুবতী দাঁ হাতে নিয়ে উভয় হাত কোমরের বাঁ পাশে রেখে দুই মাত্রার সঙ্গে দ্রুত পদক্ষেপ দিয়ে একটি লম্বা সরলরেখায় নৃত্যস্থলে প্রবেশ করে এবং একটি চতুষ্কোন নক্সার সৃষ্টি করে নৃত্যস্থলের চারদিকে যায়। এদের দ্রুত পদক্ষেপ নেবার ফলে উরুর যে ভঙ্গী হচ্ছে, তাতে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত উরুর ক্রিয়া 'নিবর্তনের' সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়। (নিবর্তন–গোড়ালীকে ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে টেনে নেওয়া হলে তাকে নিবর্তন বলে) এই দ্রুতগতিতে যাবার ফলে মেয়েদের সমস্ত দেহে একটি দোলার সৃষ্টি হয়। একই পদক্ষেপে যুবতীরা নৃত্যস্থল থেকে প্রস্থান করে।

৫ নং ভঙ্গী

অভিনয় দর্পণের মুদ্রার সাদৃশ্য

যুবক-যুবতীরা দুটো সারিতে বিভক্ত হয়ে একই পদক্ষেপ নিয়ে নৃত্যস্থলে আসে এবং দুপাশে বিভক্ত হয়ে, দা দিয়ে গর্ত করে। বাঁ হাতে অভিনয় দর্পণ গ্রন্থে বর্ণিত মুকুল মুদ্রার মত হস্ত করে গর্তের মধ্যে বীজ দেওয়ার ভঙ্গী করে। (মুকুল মুদ্রা– পাঁচটি অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করা হলে মুকুল মুদ্রা বলে।)

৬ নং ভঙ্গী

অভিনয় দর্পণের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

যুবকরা হাতে দা নিয়ে এবং যুবতীরা কোমরে হাত রেখে একই পদ সঞ্চালন নৃত্যস্থল ঘুরে এসে একটি সারি অপর সারির দিকে পিছনে ফিরে বসে দুহাতে দা ধরে দ্রুতভাবে সামনে পিছনে চালনা করে ধান গাছে নিড়ানি দেওয়ার ভঙ্গী করে। বসার এই ভঙ্গীটির সঙ্গে অভিনয় দর্পণে বর্ণিত 'সমসূচী মণ্ডলমে'র সাথে কিছুটা সাদৃশ্য আসে। (সমসূচীমণ্ডলম–পাদোগ্রদ্বয় ও জানুদ্বয় দ্বারা ভূতল স্পর্শ করে অবস্থান করলে তাকে 'সমসূচীমণ্ডলম' বলে। যদিও এখানে জানুদ্বয় মাটিতে স্পর্শ করেনি, শুধু পাদোগ্রদ্বয় ভূতল স্পর্শ করেছে। সেজন্যই বলা হয়েছে এই মণ্ডলটির সাথে এদের এই ভঙ্গীর কিছুটা সাদৃশ্য যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।)

৭ নং ভঙ্গী

অভিনয় দর্পণের ভঙ্গীর সঙ্গে সাদৃশ্য

যুবকরা হাতে দা নিয়ে এবং যুবতীরা মাথায় খাড়া বেঁধে ও হাতে দা নিয়ে দুই সারিতে দুপাশে ঘুরে ঘুরে ধান কাটার ভঙ্গী করে। এখানে যুবকরা এক পা তুলে

লাফিয়ে লাফিয়ে ধান কাটার ভঙ্গী করে। (এক পা তুলে লাফানোর সঙ্গে অভিনয় দর্পণ অনুযায়ী উৎপ্লবন (লম্ফন) ভেদ লক্ষণের মধ্যে 'আশ্বোৎপ্লবনমে'র সঙ্গে খানিকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। অশ্বোৎপ্লবনম–যে কোন চরণকে একটু উঁচু করে লাফিয়ে পশ্চাদভাগে অপর চরণকে সংলগ্ন করে হস্তদ্বয়কে ত্রিপতাকা করলে 'অশ্বোৎপ্লবনম্' হয়। এখানে শুধু এক পায়ে লাফানর ভঙ্গীর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়।)

৮ নং ভঙ্গী

নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য

যুবতীরা ধান খাড়াতে (লাঙ্গা) করে এবং যুবকরা দুহাত মাথায় তুলে ধান নেবার ভঙ্গী করে নৃত্যস্থলটি প্রদক্ষিণ করে এসে মাঝখানে নামিয়ে রাখে এবং এক সারিতে দাঁড়িয়ে দুটো হাত দুপাশে রেখে যুবক-যুবতীরা পা দুটো সামনে পিছনে চালনা করে। (ভঙ্গীটি অনেকটা নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত 'চাষগতি' ভৌমিচারীর মত। চাষগতি–ডান পা সামনে রেখে তারপরই আবার পিছন দিকে টেনে আনতে হবে এবং সেই সঙ্গে বাঁ পা-কেও সামনে পিছনে চালনা করতে হবে।)

যুবক-যুবতীরা বৃত্তাকারে লাফিয়ে লাফিয়ে দুপাশে হাতে তালি দিয়ে ঘুরে ঘুরে নৃত্যস্থান থেকে প্রস্থান করে।

ত্রিপুরী উপজাতিদের অধিকাংশের মধ্যেই জুম নাচের গতি এবং প্রকৃতি একই প্রকার। স্থানভেদে ত্রিপুরী উপজাতি গোষ্ঠীর জুম নৃত্য উপস্থাপনার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দৃশ্যমান। যেমন জুম নাচে কোথাও বৃত্তাকার, অর্দ্ধবৃত্তাকার নৃত্য-নকশা দেখা যায়। আবার কোথাও একটি সরলরেখায় নৃত্য করার প্রবণতা দেখা যায়। কোথাও কোথাও ত্রিপুরী উপজাতি নৃত্য দলগুলো চার মাত্রার ছন্দে নৃত্যটি উপস্থাপনা করে। আবার কোনও কোনও ত্রিপুরী উপজাতির নৃত্য দলকে পিছনে পা টেনে চলার ভঙ্গীতে নৃত্য করতে দেখা যায়।

ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষিভিত্তিক আরও একটি নৃত্যের প্রচলন আছে। নৃত্যটির নাম 'লেবাঙ্গ বুমানি'।

কক্‌বরক ভাষায় 'লেবাং' শব্দ হচ্ছে এমন একটি পতঙ্গের নাম, যে পতঙ্গ জুমে উৎপাদিত ফসল নষ্ট করে। 'বুমা' অর্থাৎ কৌশল করে পোকা ধরা। 'লেবাং বুমানি' শব্দের অর্থ হচ্ছে লেবাং পোকা ধরা। জুমে 'মামী' ধান বলে এক ধরনের লাল রঙের গোল গোল ধান হয়। লেবাং পোকার চোখ ও ঐ মামী ধানের মত লাল।

ত্রিপুরী উপজাতিদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, যে পরিবার যত বেশী পোকা ধরতে পারবে তার জুম ক্ষেতে তত বেশী ধান হবে। এই জন্য পোকা ধরার

ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা হত। জুম কৃষি ক্ষেত্রেই এই পোকার প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্রায় আড়াই থেকে তিন সেন্টিমিটার লম্বা এই পতঙ্গ গাছের ফুল থেকে শুটি সব কিছুই আক্রমণ করে এবং নষ্ট করে ফেলে। সাধারণতঃ শুক্লপক্ষেই শস্য ক্ষেত্রের উপর এই পোকার আক্রমণ হয়। তাই পোকা ধ্বংসের জন্য দলে দলে উপজাতি যুবক-যুবতীরা জুম ক্ষেত্রে অভিযান চালায়। পোকাগুলো এক ধরনের 'ট্রের' 'ট্রের' শব্দ করে। এই পোকাগুলোকে বিভ্রান্ত করে ধরার জন্য উপজাতি পুরুষরা এক হাতের মত লম্বা বাঁশের দুটো কাঠি নিয়ে, কাঠি দুটো পরস্পর আঘাত করে লেবাং পোকার অনুকরণে শব্দ করে। এই ছন্দোময় শব্দটি লেবাং পোকাদের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে এবং এই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে পোকাগুলো নীচে নেমে আসে। তখন মেয়েরা দল বেঁধে পোকাগুলো ধরে থলিতে রেখে দেয়।

কাঠি বাজিয়ে পোকা ধরার এই পদ্ধতি কালক্রমে ত্রিপুরী উপজাতিদের সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ হয়ে একটি নৃত্যের সৃষ্টি হয়। যার নাম পোকাদের নামের অনুকরণেই 'লেবাঙ্গ বুমানি' হয়ে যায়।

পূর্বে দেহের চারদিকে কাঠিতে দশবার আঘাত করে নৃত্যটি করা হত। এমন-ভাবে কৌশল করে দেহের চারদিকে ঘুরিয়ে কাঠি বাজান হত যে দেহে কোথাও একটি পোকা বসতনা। অথচ কাঠির আঘাতে মারা পড়ত।

বর্তমানে দেহের চারদিকে কাঠিতে পাঁচবার আঘাত করে নৃত্যটি করা হয়।

এই লেবাঙ্গবুমানি নৃত্যটি জুম কৃষিভিত্তিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেহেতু জুম ক্ষেতে লেবাঙ্গ পোকা ধরা—এই বিষয়টি ফসল অর্থাৎ খাদ্যোৎপাদনের সঙ্গে জড়িত সেজন্যই নৃত্যটিকে কৃষিভিত্তিক পর্যায়ে ফেলা হল।

বর্তমানে এই নৃত্যটি ত্রিপুরী উপজাতিদের অন্যতম বৈচিত্র্যপূর্ণ নৃত্য। নিম্নে একটি লেবাঙ্গবুমানি নৃত্যের বর্ণনা ও আলোচনা করা হল।

লেবাঙ্গবুমানি

১ নং ভঙ্গী

আটজন যুবক হাতের কাঠি দুটোকে বাজাতে বাজাতে নৃত্যমঞ্চে দৌড়ে ঢুকে নৃত্যস্থলটির চারদিকে বাজিয়ে এসে দুটো সারিতে বসে কাঠি বাজাতে থাকে।

২ নং ভঙ্গী

নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

কাঠি দুটো ধরে দুপাশে রেখে উপরে, পাশে পোকা খোঁজার ভঙ্গী করে এবং হঠাৎ করে পোকা দেখার অভিব্যক্তি করে উপরে, পাশে, নীচে ইত্যাদি স্থান থেকে পোকা ধরে কোমরের থলিতে রেখে দেওয়ার ভঙ্গী করে। (এই ভঙ্গীটিতে পোকা দেখা এবং খোঁজার অভিব্যক্তিটি এরা খুব সুন্দরভাবে চোখের দৃষ্টিতে ও মুখে ফুটিয়ে তোলে। ওদের হঠাৎ করে পোকা দেখার যে দৃষ্টি তার সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত 'আলোকিত' দৃষ্টির সাদৃশ্য দেখা যায়। যখন উপর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে পোকা দেখতে পাওয়ার পর যে অভিব্যক্তি করে তাতে 'আলোকিত' দৃষ্টির প্রয়োগ হয়, যখন পোকা খুঁজে পেয়ে ধরে তখন 'উল্লোকিত দৃষ্টি'-র প্রয়োগ এবং নীচের দিকে পোকা খুঁজে দেখার সময় 'অবলোকিত' দৃষ্টির প্রয়োগ হয়। (আলোকিত দৃষ্টি—হঠাৎ কোন জিনিসকে দেখতে হলে যে দৃষ্টি তাকে 'আলোকিত' বলে। উল্লোকিত দৃষ্টি—উপর দিকে তাকিয়ে কিছু দেখাকে 'উল্লোকিত' দৃষ্টি এবং নীচের দিকে চেয়ে দেখাকে 'অবলোকিত' দৃষ্টি বলে।)

৩ নং ভঙ্গী

আটজন যুবতী সামনে এক হাত রেখে পোকা দেখার ভঙ্গী করে দৌড়ে নৃত্যস্থলে এসে যুবকদের মাঝে দুই সারিতে দাঁড়ায়।

৪ নং ভঙ্গী

অভিনয় দর্পণের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

যুবকরা দুই সারিতে বসে কাঠিতে তাল বাজিয়ে পোকাদের আকৃষ্ট করার ভঙ্গী করে। (এখানে ছেলেদের বসার ভঙ্গীর মধ্যে অভিনয় দর্পণে বর্ণিত 'পার্শ্বসূচীমণ্ডলমে'-র সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়। পার্শ্বসূচীমণ্ডলম—চরণ দ্বয়ের অগ্রভাগ দ্বারা এবং এক পার্শ্বে জানু দ্বারা ভূতল স্পর্শ করে অবস্থান করতে যেরূপ স্থিতি হয়, তাকে 'পার্শ্বসূচীমণ্ডলম' বলে) যুবতীরা দুটো পতাকা হস্তকে পাশাপাশি মিলিয়ে নীচু থেকে পোকা তোলার ভঙ্গী করে।

৫ নং ভঙ্গী

যুবতীরা যুবকদের কাছে গিয়ে দেহকে বাঁকিয়ে যুবকদের কানের কাছে ওদের মুখ দিয়ে এবং বাঁ হাতে সূচীমুখ মুদ্রা করে দূরে পোকা দেখানোর ভঙ্গী করে। সেই

সঙ্গে যুবকরাও অনুরূপ হস্তভঙ্গী করে যুবতীদের পোকা দেখাবার ভঙ্গী করে। (এই ভঙ্গীটি আধুনিক সংযোজন। যদিও আধুনিক, তথাপি খুব সুন্দরভাবে নৃত্যে ভঙ্গীটির প্রয়োগ করা হয়েছে। ছেলেদের কাঁধে হাত রেখে যুবতীরা হেসে দূরে পোকা দেখাবার অভিব্যক্তিটি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে।)

৬ নং ভঙ্গী

যুবকরা ধীরে ধীরে বসা থেকে কাঠি দুটো বাজাতে বাজাতে উঠে দাঁড়ায় এবং যুবতীরা চার মাত্রার পদক্ষেপ দিয়ে নীচু হয়ে উভয় হাত পল্লব মুদ্রা করে সঞ্চালন করে উপরে তোলে। (পল্লব–পতাকা হস্তদ্বয়কে মণিবন্ধ থেকে বিচ্যুত করলে 'পল্লব' হস্ত হয়)।

৭ নং ভঙ্গী

অভিনয় দর্পণের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

যুবকরা ডান ও বাঁ পা পর্যায়ক্রমে তুলে লাফিয়ে দুই হাতে পায়ের নীচে, পিছনে এবং মাথার উপরে তুলে কাহি বাজাতে থাকে এবং যুবতীরা নিজেদের জায়গায় ঘুরে ঘুরে বাঁ হাত মুষ্ঠিবদ্ধ অর্থাৎ পোকা মুঠোর মধ্যে আছে–এই ভঙ্গী করে ডান হাত দিয়ে উপর থেকে পোকা ধরে বাঁ হাতে রাখার ভঙ্গী করে। এই ভঙ্গীটি করে যুবক-যুবতীরা একটি নৃত্য নক্সা তৈরী করে। প্রথমে দুটো সারিতে বিভক্ত হয়ে করে, পরে সারি দুটো ভেঙ্গে দিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে এসে পুনরায় চারটি সারিতে বিভক্ত হয়ে নাচ করে। (এই ভঙ্গীটিতে এক পা তুলে লাফানোর ভঙ্গীমার মধ্যে অভিনয় দর্পণে বর্ণিত 'চংক্রমণচারী'-র প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। চংক্রমণচারী চরণদ্বয়ের দুইপার্শ্ব যত্নপূর্বক তুলে বার বার গমন করলেই তাকে চংক্রমণকারী বলে।)

৮ নং ভঙ্গী

নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গীর প্রয়োগ

যুবকদের দুটো সারির মাঝে যুবতীরাও দুটো সারিতে দাঁড়িয়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে শরীর বাঁকিয়ে একজনের মুখের কাছে অপর জনের মুখ নিয়ে, এক হাত কিছুটা অর্দ্ধচন্দ্র মুদ্রার মত করে মুখের সামনে রেখে কানে কানে কিছু বলার ভঙ্গী করে। অর্থাৎ কতটা লেবাঙ্গ পোকা পাওয়া গেছে সেটাই একে অপরের কাছে বলার ভঙ্গী করে। (অর্দ্ধচন্দ্র হস্ত–নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী যে হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সহ ধনুর

ন্যায় অবনত হয় তাকে অর্দ্ধচন্দ্র হস্ত বলে। কিন্তু এরা যখন এই মুদ্রাটি প্রয়োগ করে হাতটি অবনত অবস্থায় না রেখে সোজাভাবে মুখের কাছে রাখে।)

৯ নং ভঙ্গী

যুবতীরা চতুষ্কোনে বসে পোকা ধরার ভঙ্গী করে। যুবকরা এদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে কাঠি বাজাতে থাকে।

১০ নং ভঙ্গী

যুবক ও যুবতীরা দুই সারিতে দাঁড়িয়ে হাত দুপাশে রেখে ডান ও বাঁ পা সামনে পিছনে চালনা করে। (পায়ের ভঙ্গী নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত চাষগতি ভৌমিচারীর মত।)

১১ নং ভঙ্গী

যুবকরা দেহকে বাঁকিয়ে একবার ডান পাশে কাঠিদুটো তিনবার বাজায়। অনুরূপভাবে বাঁ পাশেও করে। যুবতীরা একইভাবে হাতে তালি দেয়।

১২ নং ভঙ্গী

যুবকদের দুটো সারির মাঝে যুবতীরা দুটো সারিতে দাঁড়িয়ে দুটো হাত 'পল্লব' হস্ত করে নীচু থেকে আন্দোলিত করে উপরে তুলে ডানপাশে কপিত্থ মুদ্রা করে রাখে। একইভাবে বাঁদিকেও করে। যুবকরা এক পা তুলে লাফিয়ে এক হাত পাশে রেখে, অপর হাতটি কাঠি ধরা অবস্থায় উপরে তুলে যুবতীদের বিপরীত দিকে রাখে।

১৩ নং ভঙ্গী

যুবক ও যুবতীরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, এক হাত মুঠো করে অপর হাত দিয়ে পোকা ধরে এনে যুবতীরা মুঠোতে রাখার ভঙ্গী করে এবং যুবকরা নীচুতে একবার কাঠি বাজিয়ে, উপরে তুলে কাঠি বাজাতে থাকে। এই ভঙ্গীটি পুনরায় পরস্পর পরস্পরের বিপরীত দিকে ফিরে করে।

যুবকরা লাফিয়ে লাফিয়ে কাঠি বাজাতে বাজাতে এবং যুবতীরা হাতে তালি দিতে দিতে নৃত্যস্থল থেকে প্রস্থান করে।

হালাম সম্প্রদায়ের লুইনিং ওম বা জুম নৃত্য

জুম নাচ বা লুইনিং ওমের পর্ব

ত্রিপুরার অন্যতম উপজাতি হালাম সম্প্রদায়ের মধ্যেও জুম নৃত্য বা লুইনিং ওমের প্রচলন আছে। ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মতো এরাও জুম নাচটিকে (লুইনিং ওম) ৭টি ভাগে ভাগ করে উপস্থাপনা করে। যথা–

১। রামেসু ওত্ (জুম দেখা)
২। পাম্-আবাত্ (জুম কাটা)
৩। সাঙ আতু (ধান রোপন)
৪। লুইয়েচুওন (জুম বাছাই)
৫। সাঙ আত্ (ধান কাটা)
৬। আন্চিল্ (ধান মাড়াই)
৭। ভু-পেইল (ধান বয়ে ঘরে আনা)

এখানে হালাম উপজাতিদের জুম নাচের বর্ণনা দেওয়া হল পর্যায় ক্রমিকভাবে।

জুম নৃত্য (লুইনিঙওম)

১ নং ভঙ্গী - 'রামেসুওত্' (জুম নির্বাচন)

একটি যুবক হাতে বাঁশের কাঠামো ও ছোট একটি বাঁশ নিয়ে এবং অপর একজন যুবক হাতে দা নিয়ে চার মাত্রার ছন্দে নৃত্যস্থলে এসে বাঁশের কাঠামোটি মাটিতে রেখে দা দিয়ে ছোট বাঁশের টুকরোটি চিরে সামনে ছুড়ে ফেলে। অর্থাৎ একটি নীচু এবং অন্যটি সোজাভাবে পড়লে তবে বোঝা যাবে এই জমিতে চাষ করা যাবে।

২ নং ভঙ্গী - 'পাম-আবাত্' (জুম ক্ষেতের জঙ্গল কাটা)

এক সারিতে যুবকরা হাতে 'চেখলু' (খুরপী বা দাঁ) নিয়ে এবং যুবতীরা পিঠে 'খারা' (লংথাই) ও কোমরে ধানের বীজ রাখার জন্য 'সিনেং' (থলে) বেঁধে ডান পায়ে পদক্ষেপ নিয়ে ঈষৎ লাফিয়ে চারমাত্রার ছন্দে ধীরে ধীরে নৃত্যস্থলে এসে এক হাতে জঙ্গলের আগাছা ধরার ভঙ্গী করে, অন্য হাতের দাঁ দিয়ে জঙ্গল কাটার ভঙ্গী করে বৃত্তাকারে ঘোরে।

৩ নং ভঙ্গী - 'সাঙআতু' (ধান রোপন)

তিনমাত্রার ছন্দে এক হাতের দাঁ দিয়ে মাটিতে গর্ত করার ভঙ্গী করে অপর হাতে 'মুকুল' মুদ্রা করে বৃত্তাকার হয়ে ক্রমে ডান পাশে যায়। পুনরায় একই ভঙ্গীতে বাঁ পাশে যায়।

৪ নং ভঙ্গী - 'লুইয়েচুওন' (জুম বাছাই)

যুবক-যুবতীরা দুটো সারিতে বিভক্ত হয়ে ঈষৎ নীচু হয়ে ডান হাত নীচের দিকে আন্দোলিত করে একটি সারি অপর সারিকে অতিক্রম করে।

৫ নং ভঙ্গী - 'সাঙ-আত' (ধান কাটা)

বৃত্তাকার হয়ে তিনবার ডানপাশে ধান কাটার ভঙ্গী করে। তিনবার বাঁ পাশে ধান কাটার ভঙ্গী করে।

৬ নং ভঙ্গী - 'আনচিল' (ধান মাড়াই)

হাত দুপাশে রেখে পদদ্বয় পর্যায়ক্রমে সামনে থেকে পিছনে টানা।

উপরোক্ত তিনটি ভঙ্গী প্রায় সব উপজাতিদের জুম নৃত্যে একই প্রকার দেখা যায়।

৭ নং ভঙ্গী - 'ভূ-পেইল' (ধান বাড়ীতে নিয়ে আসা)

দেহ ঈষৎ সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দুহাত মাথার উপর তুলে ধান নেবার ভঙ্গী করে বৃত্তাকারে ঘুরে প্রস্থান করে।

নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের জুম নৃত্য

ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে অন্যতম উপজাতি নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেও জুম নাচের প্রচলন আছে।

নীচে নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠার জুম নাচের বর্ণনা দেওয়া হল।

নোয়াতিয়াদের জুম নৃত্য

১ নং ভঙ্গী

পুরুষেরা হাতে দাঁ নিয়ে এক সারিতে ডান পা দিয়ে প্রথম পদক্ষেপ দিয়ে চার মাত্রার ছন্দে নৃত্যস্থলে আসে এবং প্রত্যেকে এক লাইনে সামনে দাঁড়িয়ে একটা কাঠি

মাটিতে পুঁতে জমি নির্বাচন করার পর আবার একই পদসঞ্চালন করে নৃত্যস্থল থেকে চলে যায়। পুনরায় একই পদসঞ্চালন করে হাতে দা নিয়ে এসে এবাই এক হাঁটু ভেঙ্গে বসে দুহাতে দা ধরে দা ধার দেয়।

২ নং ভঙ্গী

ভূমিকে স্পর্শ করে নমস্কার করে বাঁ হাত মুষ্টি মুদ্রা করে ডান হাতের দা দিয়ে একবার ডান পাশে আবার বাঁ পাশে জঙ্গল পরিষ্কার করার ভঙ্গী করে বেরিয়ে যায়।

৩ নং ভঙ্গী

রিয়াং উপজাতিদের প্রভাব এবং নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গী ও মুদ্রার সাদৃশ্য

মেয়েরা ও পুরুষেরা হাতে দা নিয়ে দু সারিতে চার মাত্রার ছন্দে এসে নীচু হয়ে হাতের দা দিয়ে মাটিতে গর্ত করে ডান হাতে মুকুল মুদ্রার মত করে ধানের বীজ বপন করে। এই ভঙ্গীটি করার সময় দুটো সারিতে দাঁড়িয়ে হাতের দা দিয়ে মাটিতে গর্ত করার ভঙ্গী করে নীচু হয়ে মাটিতে বীজ বপন করে সামনে এগিয়ে যায়। আবার পিছিয়ে আসে। যখন পিছিয়ে আসে তখন ছেলেরা হাতে দা নিয়ে কোমর দুপাশে দুলিয়ে চলে আসে এবং মেয়েরা নাট্যশাস্ত্রে ব্যবহৃত 'ব্যবর্তিত' ও 'পরিবর্তিত' ভঙ্গী করে রিয়াং উপজাতি মেয়েদের মত পিছিয়ে আসে। (ব্যবর্তিত– অঙ্গুলিগুলি কনিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে যখন ধীরে ধীরে ভিতরে নিয়ে আসা হয়, তাকে ব্যবর্তিত বলে। ঠিক এইভাবেই কনিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে অঙ্গুলীগুলি বাইরের দিকে লক্ষ্য করে হাত ঘুরিয়ে রাখা হয় তাকে 'পরিবর্তিত' বলে।)

৪ নং ভঙ্গী

পুরুষ ও মেয়েরা দু সারি হয়ে মাথার পিছনে দা দু-হাতে ধরে পিছিয়ে এসে বসে এবং বাঁ হাত সামনে 'পতাকা' মুদ্রায় রেখে ডান হাতে দা ধরে অল্প আন্দোলন করে। অর্থাৎ ধান গাছে নিড়ানি দেয়।

৫ নং ভঙ্গী

এক হাঁটু ভেঙ্গে বসে হাতের দাঁ দিয়ে ধান কেটে বাঁ হাতে সেই কাটা ধান ফেলা–এই ভঙ্গী করে দুই সারি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দুটো অর্দ্ধবৃত্ত রচনা করে আবার মূল বৃত্তে ফিরে আসে।

৬ নং ভঙ্গী

সবাই মাঝখানে দা রেখে দিয়ে পূর্বের মত হত 'ব্যবর্তিত' ও 'পরিবর্তিত' ভঙ্গী করে নিজেদের জায়গায় শুধু ডান পায়ে তাল রেখে ঘোরা।

৭ নং ভঙ্গী

বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে মেয়েরা পূর্বোক্ত হাতের ভঙ্গী করে ডান পা এবং বাঁ পা খুবই মৃদুভাবে এক পাশ থেকে মাঝখানে টেনে নিয়ে আসে। ছেলেরা হাত দুপাশে রেখে পায়ের একই ভঙ্গী করে। তবে একটু দ্রুতগতিতে অর্থাৎ ধান মাড়ান।

৮ নং ভঙ্গী

নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গী ও মুদ্রার সাদৃশ্য

কুলো দিয়ে ধান ঝাড়া। বৃত্তাকারে মেয়েরা বসে থাকে। প্রত্যেকটি মেয়ের পাশে একটি করে ছেলে দাঁড়িয়ে দুহাত 'সর্পশীর্ষ' মুদ্রার আকৃতি করে পাশাপাশি রেখে বাঁ কাঁধের থেকে ঘুরিয়ে ডান কাঁধের কাছে নিয়ে আসে। পুনরায় বাঁ পাশে নিয়ে যায় অর্থাৎ কুলো ঝাড়া। হস্তের এই ভঙ্গীটি অনেকটা হস্তাভিনয় 'গজদন্তে'-র মত (গজদন্ত—যখন সর্পশীর্ষ হস্তদ্বয় কনুই ও কাঁধ বক্র হয়, তখন সেই হস্তকে 'গজদন্ত' বলা হয়)। ছেলেদের ও মেয়েদের নাচের মধ্যে সবসময়ই 'উদবাহিতা' কটির প্রয়োগ হয়। (ধীরে ধীরে দুটি পার্শ্বে একটির পর একটিকে উন্নত ও অবনত করালে তাকে 'উদবাহিতা' বলে।) মেয়েদের হস্তভঙ্গীকৃত বেশীর ভাগ 'ব্যবর্তিত' ও 'পরিবর্তিত' ভঙ্গী দেখা যায়।

৯ নং ভঙ্গী

অভিনয় দর্পণের সাদৃশ্য

পুরুষ এবং মেয়েরা সবাই নীচু হয়ে হাত দুটো 'কর্কট' মুদ্রায় মাথার পিছনে রেখে অর্থাৎ লাঙ্গা বা খাড়াতে ধান ভরে উহে দাঁড়িয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে ধান নিয়ে নৃত্যস্থল থেকে বেরিয়ে আসে। (কর্কট মুদ্রা যখন দুটি হাতের অঙ্গুলীগুলি পরস্পর অন্তরবদ্ধ হয়, তখন কর্কট হস্ত হয়।)

মলশুম উপজাতিদের জুম নৃত্য

ত্রিপুরার হালাম উপজাতিদের মধ্যে যে ১২টি দফা আছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই মলশুম উপজাতি। এদের মধ্যে একমাত্র কৃষিভিত্তিক জুম নাচ প্রচলিত।

মলশুম উপজাতিদের জুম নৃত্যের পর্ব

ছেলে ও মেয়েরা একই সঙ্গে নাচটি করে। অন্যান্য উপজাতিদের মত এরাও জুম নৃত্যের প্রতিটি পর্ব পৃথক পৃথকভাবে উপস্থাপনা করে থাকে। যথা (১) চেমতাঙ (দা ধরে দেওয়া) (২) লৌওয়াত্ (জঙ্গল পরিষ্কার করা) (৩) লৌহল (জঙ্গলে আগুন দেওয়া) (৪) মাংরুথম (আগুন দেবার পর ছাই পরিষ্কার করা) (৫) সংতু (ধান লাগান), (৬) লীচুনু (নিড়ানি দেওয়া) (৭) সঙঅত্ (ধান কাটা) (৮) সংহিন্চইয়াত্ (খাড়ায় করে ধান নিয়ে আসা) (৯) আইহিংচৈতা (বাড়ীতে ধান নিয়ে আসা)।

১ নং ভঙ্গী –'চেমতাঙ' (দা ধার দেওয়া)

তিনজন পুরুষ দাঁড়িয়ে চার মাত্রার ছন্দে নৃত্যস্থলে এসে বসে দা নিয়ে ধার দেয়। (এদের ধার পরীক্ষার পর্বটি দেখলে মনে হয় এদের মধ্যে অভিনয়ের প্রবনতা রয়েছে।)

২ নং ভঙ্গী –লৌওয়াত্ (জঙ্গল পরিষ্কার করা)

চারজন মেয়ে এক সারিতে নৃত্যস্থলে এসে নীচু হয়ে দুইহাত মুষ্টি মুদ্রা করে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে জঙ্গল পরিষ্কার করার ভঙ্গী করে। এরপর নৃত্যস্থলে উপবিষ্ট পুরুষরা উঠে এসে মেয়েদের সাথে যোগ দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে। এই ভঙ্গীটি করে মেয়েরা নৃত্যস্থল থেকে চলে যায়।

৩ নং ভঙ্গী –লৌহল (জঙ্গলে আগুন দেওয়া)

নৃত্যস্থলে উপবিষ্ট দু'জন পুরুষ একটি বাঁশ থেকে কিছু আঁশ বের করে নিয়ে অন্য একটি বাঁশ দিয়ে ঘষে তাতে আগুন ধরায় (এই পদ্ধতিটি আদিম)। দুজন মেয়ে হুঁকো নিয়ে নৃত্যস্থলে এসে পুরুষদের হাতে দেয় এবং পুরুষরা হুঁকো খাওয়ার ভঙ্গী করে।

৪ নং ভঙ্গী –মাংরুথম (আগুন দেবার পর ছাই পরিষ্কার করা)

মেয়েরা বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে দুহাত দিয়ে ছাই জড়ো করে একপাশে ফেলে দেওয়ার ভঙ্গী করে।

৫ নং ভঙ্গী –সংতু (ধান লাগান)

মেয়েরা নীচু হয়ে হাতের দা দিয়ে গর্ত করার ভঙ্গী করে ডান হাতে মুকুল মুদ্রা করে ধানের বীজ বপন করার ভঙ্গী করে বৃত্তাকারে ঘোরে। ছেলেরা মেয়েদের

বৃত্তের বাইরে আর একটি বৃত্ত রচনা করে একই ভঙ্গীতে বীজ বপন করার ভঙ্গী করে। ভঙ্গীটি সকবার বৃত্তের অন্তর্মুখী হয়ে করে। একবার বহির্মুখী হয়ে করে।

৬ নং ভঙ্গী –'লাওচুনু (নিড়ানি দেওয়া) এবং 'সংঅত' (ধান কাটা) এই দুটো অংশ একই সঙ্গে পরিবেশন করে।

পুরুষরা নীচু হয়ে এক হাতে দা নিয়ে ঈষৎ সঞ্চালন করে নিড়ানি দেওয়ার ভঙ্গী করে এবং মেয়েরা পুরুষদের সামনে একটি বৃত্ত রচনা করে এক হাতের দা দিয়ে ধান কাটার ভঙ্গী করে অপর হাত দিয়ে ধান পিছনে ফেলার ভঙ্গী করে।

৭ নং ভঙ্গী –'সংহিনচইয়াঙ' (খাড়ায় করে ধান নেওয়া) এবং 'আইহিঙচৈতা' (বাড়ীতে ধান নিয়ে আসা) এই অংশ দুটি ও একই ভঙ্গীতে করা হয়।

ছেলেরা এবং মেয়েরা পর্বোক্ত ধান কাটার ভঙ্গী করে হাতের দা রেখে একবার ডান পাশে জোড় পায়ে লাফিয়ে, একবার বাঁ পাশে লাফিয়ে গিয়ে দুটো সারি হয়। মাথায় দুহাত বর্দ্ধমানেক মুদ্রায় রেখে অর্থাৎ ধান ভর্ত্তি খাড়া ধরার ভঙ্গী করে দুটো সারি থেকে পুনরায় একটি বৃত্ত রচনা করে যুবক এবং যুবতীরা একবার ঘুরে ধান বাড়ীতে নিয়ে আসার ভঙ্গী করে।

জুম নৃত্যটির এই সময় থেকে মলশুম উপজাতিরা কোন পর্বে ভাগ না করে পর পর নৃত্যটি উপস্থাপনা করে যায়। কিন্তু নৃত্যটি বিশ্লেষন ও আলোচনা করার সুবিধার্থে প্রতিটি ভঙ্গী ভাগ করে দেখান হল।

৮ নং ভঙ্গী –'ধান ভানা এবং ধান ঝাড়া'

এই দুটো ভঙ্গীও এরা পাশাপাশি করে। অর্থাৎ তিনটি মেয়ে একপাশে ধান ভানার ভঙ্গী করে এবং মুখোমুখি দাঁড়ান অপর তিনটি মেয়ে ধান ঝাড়ার ভঙ্গী করে।

মেয়ে তিনজন কর্কট মুদ্রা করে 'চিয়া' ধরার ভঙ্গী করে, একবার উপরে হাত উঠিয়ে এবং নামিয়ে 'গাইলে' ধান ভানার ভঙ্গী করে এবং মুখোমুখি দাঁড়ান মেয়েরা দুহাত উপরে তুলে দুবার দুপাশে চালনা করে ধান ঝাড়ার ভঙ্গী করে।

৯ নং ভঙ্গী –'ধানের থলে ধরে মাটিতে আছড়ে ধুলো ঝাড়া '

মেয়েরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক পা সামনে রেখে এক হাত মুষ্টি মুদ্রা করে সজোরে ঘুরিয়ে সামনে রাখে। অর্থাৎ ধান ভানার পর ধান ঝেড়ে সেই ধানগুলো চটের থলেতে রেখে আরও ভাল করে ধানগুলো ঝাড়ে। সেটাই পূর্বোক্ত ভঙ্গীর মাধ্যমে মেয়েরা উপস্থাপনা করে।

১০ নং ভঙ্গী –'জুম থেকে কার্পাসের বীজ এনে তার থেকে তুলো বের করা'

এখানেও মেয়েরা অর্দ্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে এক পা সামনে রেখে দেহকে ঘুরিয়ে এনে হাত কপিথম মুদ্রা করে নীচু হয়ে তুলার বীজে আঘাত করার ভঙ্গী করে।

১১ নং ভঙ্গী –'তুলো ধুনো করা'

মেয়েরা দুই সারিতে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ সামনে পিছনে দুটো সারি হয়ে এক হাত মুষ্টি করে নীচুতে রেখে অপর হাত পাশে সঞ্চালন করে নৃত্যস্থলটি প্রদক্ষিন করে।

১২ নং ভঙ্গী –'তুলো আর ও মিহি করা'

দুজন মেয়ে এক পা প্রসারিত করে বসে এবং একহাত কপিথম মুদ্রায় রেখে প্রসারিত করে। অপর হাতটি কপিথম মুদ্রা করে সামনে থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে এবং সেই সঙ্গে দেহকেও সামনে পিছনে আন্দোলন করে। এই ভঙ্গীটি করাকালীন সামনে তিনটি মেয়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে বীজ ফাটানোর ভঙ্গী করে।

১৩ নং ভঙ্গী –'তুলো থেকে সূতো বের করা'

মেয়েরা বসে বাঁ হাত কপিত্থ মুদ্রা করে বাঁ পাশে উপরে রেখে ঘোরায় এবং ডান হাত কপিত্থ করে সামনে রেখে ঘোরাতে থাকে।

১৪ নং ভঙ্গী –'তুলো থেকে বের করা সূতো কাঠির মধ্যে জড়ান'

দুটো মেয়ে হাঁটুর উপর বসে নীচু হয়ে দুহাত পতাকা করে সামনে পিছনে চালনা করে অর্থাৎ সূতোগুলো কাঠির মধ্যে জড়াতে থাকে। মুখোমুখি চারজন মেয়ে দাঁড়িয়ে হাতে তালি দিতে থাকে।

ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের "মামিতা" নাচের একটি ভঙ্গীমা

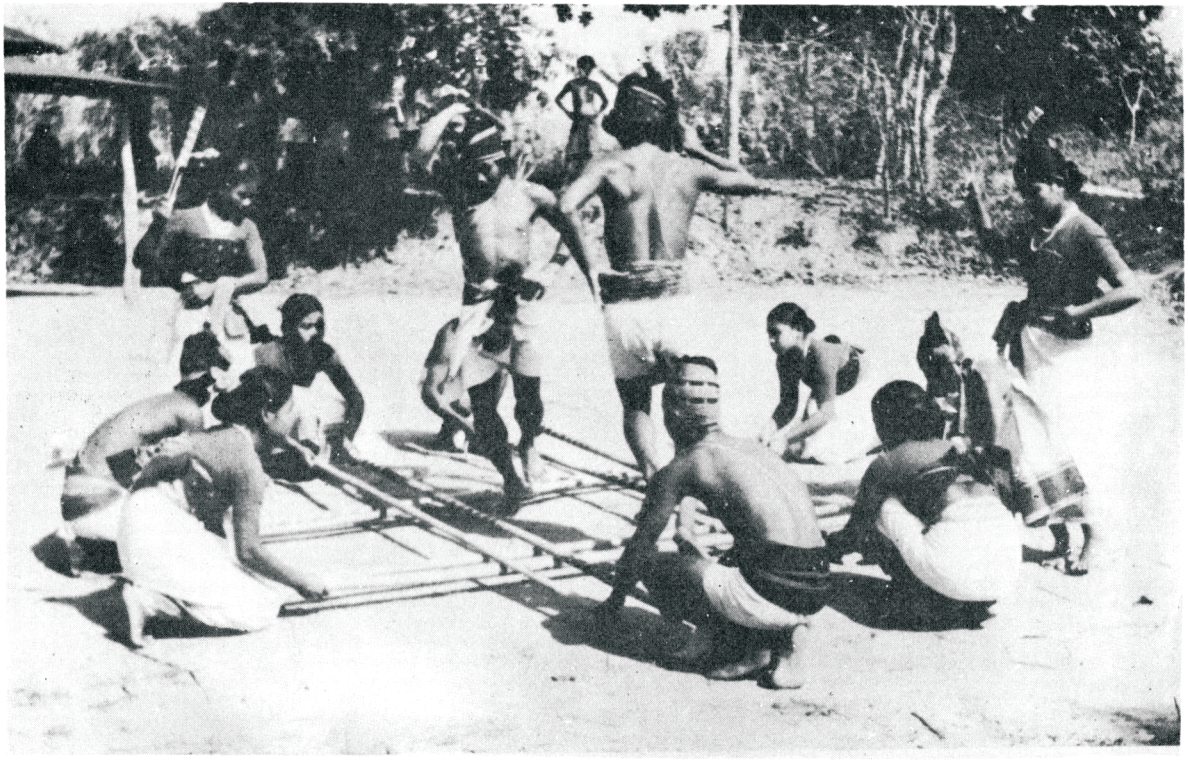

"মামিতা ওয়া মুসামো" নৃত্যের একটি দৃশ্য

ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের "জুম" নৃত্যের একটি দৃশ্য

ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের "গড়িয়া" নৃত্যের একটি দৃশ্য

জমাতিয়া সম্প্রদায়ের "গড়িয়া" নৃত্যের একটি দৃশ্য

রিয়াং সম্প্রদায়ের মৃত্যুর পর পাঁচটি পর্যায়ের অন্যতম "কু-থৈ-নাইম" পর্যায়ের নৃত্যের একটি ভঙ্গী

রিয়াং উপজাতিদের "হজাগিরি" নৃত্যের একটি ভঙ্গীমা

হালাম উপজাতিদের প্রশাখা মলশুম উপজাতিদের "জুম" নৃত্যের একটি ভঙ্গী

হালাম উপজাতিদের প্রশাখা রূপনী সম্প্রদায়ের "গড়িয়া" নৃত্যের একটি ভঙ্গী

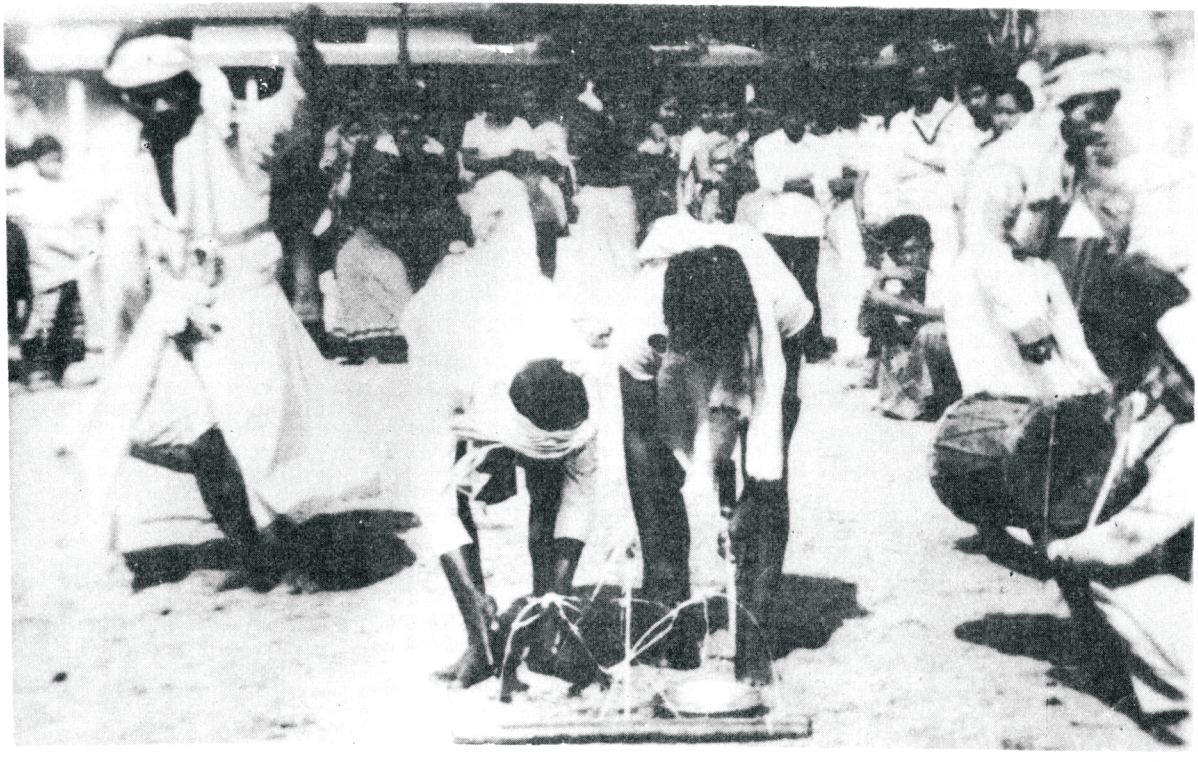

হালাম উপজাতিদের "ভায়লাম" নৃত্যের একটি দৃশ্য

মগ সম্প্রদায়ের "পে সেঃ য়ে আকার" একটি নৃত্য ভঙ্গিমা

কুকী উপজাতিদের তাংগডাম নৃত্যের একটি দৃশ্য ভঙ্গীমা

কুকী উপজাতিদের প্রশাখা দারলং উপজাতিদের "জ্যাঠ লুয়াং" নৃত্যের একটি পর্যায় "বাধু ইনদি"-র একটি ভঙ্গীমা

খাসিয়া উপজাতিদের "পাস-তি-এ" নৃত্যের একটি দৃশ্য

ত্রিপুরার সাঁওতাল উপজাতিদের "দাঁ বাপলা" নৃত্যের একটি ভঙ্গিমা

ওঁরাও উপজাতিদের "ফাগুয়া" নৃত্য

১৫ নং ভঙ্গী –'বাঁশের খুঁটিতে সূতো বাঁধা'

মেয়েরা বসে নীচু হয়ে দুই হাত পতাকা মুদ্রা করে নিম্নাভিমুখী রেখে বাঁ পাশ থেকে সামনে কয়েকবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। অর্থাৎ তাতে কাপড় বোনার পূর্বে মাটিতে বাঁশের খুঁটি পুঁতে এর মধ্যে সূতো ঘুরিয়ে রাখা হয়।

১৬ নং ভঙ্গী –'কোমর তাঁতে কাপড় বোনা'

মেয়েরা বসে দুহাত কপিত্থ করে ডান পাশ থেকে বাঁ পাশে নিয়ে যায় এবং বাঁ পাশ থেকে ডান পাশে নিয়ে আসে।

১৭ নং ভঙ্গী

সব কাজ শেষ হওয়ার পর হাততালি দিয়ে আনন্দে নৃত্য করে নৃত্যস্থল থেকে বেড়িয়ে যায়।

এই মলশুম উপজাতিদের জুম নৃত্যের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তির্যকভাবে কটিদেশ সঞ্চালন করা হয়। কটিদেশের এরুপ সঞ্চালনের সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত 'প্রকম্পিতা' (sharking) কটির সাদৃশ্য আসে। তির্যকভাবে উপরনীচ করতে গেলে কটিদেশের যে ভঙ্গী হয়, তাকে 'প্রকম্পিতা' কটি বলে। মলশুম সম্প্রদায়ের জুম নৃত্যটির ভঙ্গীমায় নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত পতাকা, কর্কট, কপিথম, পুষ্পপুট ইত্যাদি মুদ্রা এবং 'হস্তলক্ষন দীপিকায়' উল্লেখিত বর্দ্ধমানেক' মুদ্রার প্রয়োগ দেখা যায়। (পতাকা– সংহত অঙ্গুলী সমূহের অগ্রভাগ প্রসারিত এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত থাকবে। কপিথম হস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গলী সমূহের অগ্রভাগ করতাল মধ্যে স্থিত এবং তর্জনী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পীড়িত হলে কপিথম হস্ত বলা হয়। বর্দ্ধমানেক উত্থিত অঙ্গুষ্ঠের গোড়ায় তর্জনীর অগ্যভাগ সংযুক্ত করে, বাকি অঙ্গুলীগুলি বক্রভাবে রাখলে বর্দ্ধমানেক মুদ্রা বলা হয়।)

গারো উপজাতিদের জুম নৃত্য

ত্রিপুরার অপর উপজাতি সম্প্রদায় গারোদের মধ্যেও জুম কৃষি জীবনকে অবলম্বন করে জুম নাচ প্রচলিত আছে। গারো উপজাতির ছেলেরা ও মেয়েরা উভয়ে মিলে এই নাচটি পরিবেশন করে। গারো উপজাতিরা ও জুম নাচকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে উপস্থাপনা করে।

প্রথম পর্যায়ে দেখান হয় গারোরা তিব্বত থেকে আসছে। গারো ভাষায় এর নাম 'থিবেটনিয়াসং' (তিব্বত থেকে আসা), দ্বিতীয় 'অথিয়ান সেঙন্তা (দা ধার করা), তৃতীয়

'আবাহুয়া' (জুমের জন্য জঙ্গল কাটা), চতুর্থ 'মিগিয়া' (ধান খোঁচা দেওয়া), পঞ্চম 'মিয়াকা' (ধান কাটা), ষষ্ঠ 'দাখারি' (ধান কাটার পর বিনি পূজা উপলক্ষে গ্রামের যুবক-যুবতীদের কাঠ সংগ্রহ করা), সপ্তম 'বিল্‌সি্‌গিথাল' (আশ্বিন মাসে ধান কাটার পর আনন্দ করা)।

১ নং ভঙ্গী –'থিবেটনিয়াসৎ (তিব্বত হতে আসা)

এক সারিতে ৪ জন মেয়ে, আর এর সারিতে ৪ ছেলে, এবং সামনে একজন ঢাল ও তলোয়ার নিয়ে দুই মাত্রার ছন্দে পদক্ষেপ নিয়ে নৃত্যস্থলে প্রবেশ করে। মেয়েরা ও ছেলেরা হাত মুষ্টি করে পাশে ঝুলিয়ে ডান পা ও বাঁ পা যথাক্রমে দুই মাত্রার ছন্দে একবার পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে মাটিতে আঘাত করে, আবার সমভাবে মাটিতে আঘাত করে–এইভাবে পদ সঞ্চালন করে নৃত্যস্থলে আসে। গারো উপজাতিদের ওঝা বা 'কামোল' দুটো সারির সামনে দাঁড়িয়ে শরীর আন্দোলন করে হাতে ঢাল ও তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে পুরো নৃত্যস্থলটি দুটো সারির সঙ্গে প্রদক্ষিন করে। অর্থাৎ তিব্বত থেকে এরা আসছে এই বিষয়টি ওরা নাচের মাধ্যমে দেখিয়ে থাকে। ওদের অগ্রভাগে কামাল (ওঝা) সমস্ত বিপদ-আপদ্ তলোয়ারের দ্বারা কাটিয়ে ওদের দলকে নিয়ে এল।

২ নং ভঙ্গী –'আথিয়ান সেঙস্তা' (দা ধার দেওয়া)

ছেলেরা ও মেয়েরা দুই সারিতে নৃত্যস্থলটি ঘুরে এসে মেয়েরা সামনে এক সারিতে বসে এবং তাদের থেকে পিছনে ফিরে ছেলেরা বসে হাতের দা নিয়ে এক-বার ডান পাশে একবার বাঁ পাশে দুবার করে দোলা দেয় অর্থাৎ দা ধার দিচ্ছে–এই ভঙ্গীটি করে।

৩ নং ভঙ্গী –'আবাহুয়া (জুমের জঙ্গল কাঁটা)

মেয়েরা ৪ জন এক সারিতে হাত মুষ্টি করে জঙ্গলের গাছপালা ধরার ভঙ্গী করে, ডান হাতের দা দিয়ে জঙ্গল কাটার ভঙ্গী করে। অনুরুপ ভাবে অন্য সারিতে ছেলেরা ও একইভাবে জঙ্গল কাটার ভঙ্গী করে। মেয়েরা এক সারিতে, ছেলেরা অন্য সারিতে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে জঙ্গল পরিষ্কার করে। এই সময়কার নৃত্য নক্সাটি অনেকটা সাঁওতালদের খোলা শৃংখল (open chain) নৃত্য নকশার নিয়মে করে।

৪ নং ভঙ্গী –'মিগিয়া' (ধানের বীজ বপন করা)

এইবার পূর্ব্বের মতই খোলা শৃংখল (open chain) নিয়মে হাতে সরু লম্বা একটি লাঠি নিয়ে, যার মাথাটি ছুঁচালো থাকে, সেইটি দিয়ে গর্ত করে বীজ দেওয়ার ভঙ্গী করে ছেলেরা ও মেয়েরা দুই সারিতে ঘুরে আসে। এই লাঠিটির নাম 'মাৎথা'।

৫ নং ভঙ্গী –'মিয়াকা' (ধান কাটা)

ছেলে-মেয়েরা দুই সারি হয়ে বাঁ হাতের মুষ্টি করে ধান গাছ ধরার ভঙ্গী করে, ডান হাতের দা দিয়ে ধান কাটার ভঙ্গী করে। ছেলেরা এবং মেয়েরা দুটো সারি হয়ে দুই মাত্রার ছন্দে পা ফেলে একবার ডান পাশে ধান কাটার ভঙ্গী করে, আবার বাঁ পাশে ধান কাটার ভঙ্গী করে। ধান কাটার পর দুই হাত কাঁধের উপর রেখে অর্থাৎ ধান কাঁধে নেওয়ার ভঙ্গী করে নৃত্যস্থল থেকে বেড়িয়ে যায়।

৬ নং ভঙ্গী –'দাখারি' (ধান ঘরে নিয়ে আসার পর বিনি পূজা উপলক্ষ্যে লাকড়ী (কাঠ) সংগ্রহ করা)

গারোদের নাচে বাংলা যাত্রার প্রতীক

এবার ছেলেরা ও মেয়েরা পুনরায় নৃত্যস্থলে এসে দুই সারিতে দাঁড়িয়ে এক হাত কেমরে রেখে, অন্য হাত নীচের দিয়ে রেখে মৃদু সঞ্চালন করে ক্রমান্বয়ে ডান পাশে ও বাঁ পাশে ঘোরে। এইরূপে কিছুক্ষন করে পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একজন অপর জনের হাত ধরে ডান পাশে উভয়ের শরীর ও মাথা বাঁকিয়ে পায়ে দুইমাত্রা তাল দিয়ে আবার বাঁ পাশে একই প্রকার ভঙ্গী করে। এই ভঙ্গীটি কয়েকবার করে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নীচু হয়ে একপাশ থেকে হাত সঞ্চালন করে একদল অপরদলকে অতিক্রম (cross) করে চলে যায়। আবার একই ভঙ্গীতে নিজের জায়গায় ফিরে আসে। এই ভঙ্গীটি ছ'বার করে পুনরায় প্রথম ভঙ্গীটি করে।

(উপরোক্ত ৬ নং পর্যায়ের ভঙ্গীগুলোর মধ্যে যাত্রায় অনুষ্ঠিত বাংলা নাচের প্রভাব দেখা যায়। যাত্রা আরম্ভ হওয়ার পূর্বমূহূর্ত্তে যে ধরনের বাংলা নাচ অনুষ্ঠিত হয়, বা যাত্রার মাঝে বিরতিতে যে নাচ হয়, সেই নাচের সঙ্গে গারো উপজাতিদের উপরোক্ত নৃত্য ভঙ্গিমার সঙ্গে সাদৃশ্যমান। ত্রিপুরার উপজাতি সমাজে যাত্রার জনপ্রিয়তার দরুন এদের নৃত্যে যাত্রায় ব্যবহৃত নাচগুলোর প্রভাব ওদের অজান্তেই এসে গেছে।)

উপরোক্ত ভঙ্গীগুলোর পর্ব একই সাথে করা হয়। অর্থাৎ ধান ঘরে নিয়ে আসার পর বিনি পূজা উপলক্ষ্যে গ্রামের যুবক-যুবতীদের লাকড়ী সংগ্রহ করা এবং আশ্বিন মাসে ধান কাটার পর আনন্দ করা–এই দুটো অংশের ভঙ্গীগুলো একই সঙ্গে করা হয়।

৭ নং ভঙ্গী –'ছাম বল মিসাতাগল খালি থলা' (ব্যাঙ নাচ)

বিনি পূজার পর গ্রামের যুবকদের নৃত্যের মাধ্যমে কৌশল প্রদর্শন, নৃত্যস্থলের মাঝখানে চারটি ছোট কাঠি পর পর সাজিয়ে রেখে একটি ছেলে হাঁটু মুড়ে লাফিয়ে যাবার সময় (ব্যাঙের অনুকরনে) মাঝের একটি কাঠি তুলে নিয়ে যায় । এরপর মেয়েরা ও ছেলেরা পূজোর পর মদ্যপানের ভঙ্গী করে নাচতে থাকে । মুখের সামনে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিয়ে তার পিছনে বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করে মদ্য পান করার ভঙ্গী করে । (হাতের এই ভঙ্গীটি শিখর মুদ্রার মত । শিখর মুদ্রার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সোজাভাবে উন্নত অবস্থায় থাকবে এবং অন্যান্য অঙ্গুলী বক্রভাবে করতলস্থিত থাকবে । পরের ভঙ্গীটিতে কামালকে (ওঝা) মাঝখানে রেখে চতুষ্কোনে দাঁড়িয়ে ডান পা তুলে মাটিতে বার বার তাল দিয়ে দুহাত দুপাশে ঘুরিয়ে নাচতে থাকে । আবার বসেও একইভাবে দুপাশে দুই হাত সঞ্চালন করে নাচতে থাকে । (এই ভঙ্গীগুলোতে ও যাত্রার নাচের ছাপ সুস্পষ্ট ।) এরপর ছেলে-মেয়েরা একই ভঙ্গী করে ধীরে ধীরে নৃত্যস্থল থেকে চলে যায় ।

চতুর্থ অধ্যায়

মানুষের জীবনে কৃষি যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের আচার-অনুষ্ঠান কৃষি জীবন ঘিরে গড়ে উঠে। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য এবং অধিক ফসলের জন্য জুমের জায়গায় বা চাষের জমিতে নানা প্রকারের আচার-অনুষ্ঠান করা হয়। ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে ও এই ধরনের আচার-অনুষ্ঠান দেখা যায়। যেমন জমি বাছাই করার সময়, জমিতে বীজ বপনের পূর্বে, ফলস সংক্রান্ত উৎসবের পূর্ব মুহূর্তে উৎসবের শুভাশুভ বিচার করা, রোগ নিরাময় ইত্যাদিতে নানা প্রকারের আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন দেখা যায়। আচার-অনুষ্ঠান মূলক নৃত্যকে কামনাপূরক নৃত্য ও বলা যেতে পারে। কারন আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গেই মানুষের কামনা জড়িত থাকে। অর্থাৎ ভাল ফললের কামনাতেই জুম ক্ষেতে আচার-অনুষ্ঠান করা, রোগ নিরাময়ের কামনাতে আচার-অনুষ্ঠান করা, গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করে আচার-অনুষ্ঠান করা প্রভৃতি নৃত্যগুলিকেই কামনা পূরক নৃত্য ও বলা যায়।

এই নৃত্যগুলো প্রকৃতপক্ষে অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস থেকেই সৃষ্টি এবং অতীতের একটি সময় থেকে অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ভিত্তিক লোকনৃত্যগুলো চলে এসেছে যা পরবর্ত্তীকালে আদিম লোকনৃত্যকলার অঙ্গীভূত হয়েছে।

কৃষিভিত্তিক লোকনৃত্যগুলোর মধ্যেই আচার-অনুষ্ঠানমূলক নৃত্যের সংমিশ্রন দেখা যায়। তাই আচার-অনুষ্ঠানমূলক নৃত্যগুলোর অধিকাংশকে কৃষি ভিত্তিক নৃত্য থেকে পুরোপুরি পৃথক করা যায় না। যেমন ত্রিপুরার প্রধান উপজাতি গোষ্ঠী ত্রিপুরী উপজাতিদের জুম নৃত্যের প্রথম পর্ব। জুম নৃত্যটি শুরু হয় জুমের যে জমিটি নির্বাচিত করা হবে সেই জমিতে ভাল ফসল হবে কিনা তা নির্নয়ের জন্য দুটো বাঁশের টুকরোর সাহায্যে শুভাশুভ বিচার করে। এছাড়া জমির উর্বরতা কামনা করে নৃত্য শুরু করার পূর্বে মোরগ বলি দিয়ে তার রক্ত জমিতে ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

এছাড়া ত্রিপুরার কক্‌বরক ভাষা গোষ্ঠীদের প্রধান উৎসব গড়িয়া পূজাকে ও কামনা পরিপূরক পূজা বলা যায়। কারন যারা ব্যক্তিগত ভাবে এই পূজা করে তারা গড়িয়া দেবতার কাছে কামনা করে তাদের সার্বিক উন্নতি, তাদের সন্তান সন্ততি যেন সুখে থাকে এবং নূতন বছর যাতে ভাল যায় এবং ফসল যেন ভাল হয়। তেমনি সমষ্টিগত ভাবে যখন পূজা করে তখন তারা গ্রামের সকলের সুখ-সমৃদ্ধি ভাল ফসল ইত্যাদি কামনা করে।

এছাড়া গড়িয়া পূজা শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত নানা প্রকারের আচার-অনুষ্ঠান ও করা হয়। পূজা অন্তে গড়িয়া দেবতার প্রতীক বাঁশটিকে নিয়ে প্রতি বাড়ীতে গিয়ে

যুবক-যুবতীরা উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে গান ও নাচ করে। উৎসবের নাম অনুসারেই নৃত্যটিকে গড়িয়া নৃত্য বলা হয়।

যেহেতু গড়িয়া নৃত্য গড়িয়া উৎসব কেন্দ্রিক, সেজন্য পরবর্ত্তী অধ্যায়ে গড়িয়া নৃত্য নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষন করেছি।

আবার কিছু নৃত্য আছে যেগুলো পুরোপুরি ভাবে আচার-অনুষ্ঠান মূলক। রিয়াং উপজাতিদের মধ্যে মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তি কে প্রদক্ষিন করে নৃত্য এবং অস্থি বিসর্জনের পাঁচটি পর্যায়ের আচার-অনুষ্ঠান ও নৃত্য প্রচলিত আছে।

কুকি উপজাতিদের মধ্যে ও শ্রাদ্ধ বা পারলৌকিক কর্ম উপলক্ষ্যে আচার-অনুষ্ঠান ও নৃত্য করা হত। (যদি ও কুকি উপজাতিরা বর্ত্তমানে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী, তবুও নৃত্যটি এখনও ওদের মধ্যে রয়ে গেছে)। এই নৃত্যটির নাম থাইডর।

হালাম উপজাতিদের ফসল ঘরে তোলার পর 'সাপিতেদয়' বা লক্ষী পূজা উপলক্ষ্যে দুটো ভাগে এরা আচার-অনুষ্ঠান সহ নৃত্য করে। যথা (১) ভায়লম ও (২) আরথন আনচু।

নোয়াতিয়া সম্প্রদায় ও ফসল ঘরে আনার পর নূতন ফলল দিয়ে লক্ষী পূজা করে–এই কামনা নিয়ে যাতে পরের বছর অধিক ফসল হয় এবং নিজেদের সুখ-সমৃদ্ধি হয়। এই লক্ষী পূজা এবং পূজা উপলক্ষ্যে এরা জুম নৃত্য করে পরবর্ত্তী পর্যায়ে এই নৃত্যটি উপস্থাপনা করে।

ত্রিপুরার অন্যতম চাকমা উপজাতিরা ও গ্রামের মঙ্গল কামনা করে নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান সহ পূজা করে এবং সেই সঙ্গে নৃত্য করে। পূজার নামানুসারেই নৃত্যটির নাম 'থানমানা' নৃত্য।

মগ উপজাতিদের মধ্যে 'ক্যাং' পূজা উপলক্ষ্যে 'ফ্রোরারিখো' বা বুদ্ধদেবের বন্দনা নাচ করা হয়। এই পূজা এবং নাচের মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধের কাছে সুখ স্বাচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। এছাড়া কল্পতরু উপলক্ষ্যে 'পেসে ঃ য়ে আকা' এবং 'পেসেদা আকা' নাচ করা হয়। এই দুটি নাচের মধ্য দিয়েই পরজন্মের সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।

গারো উপজাতিদের মধ্যে ফসলকে ঘরে এনে 'ওয়াংলা' উৎসব করা হয়। এই ওয়াংলা উৎসবটি নানা প্রকারের আচার-অনুষ্ঠান ও নৃত্য সহ করা হয়। জুম ক্ষেতে খুব ভাল ফসল উৎপন্ন হওয়া এবং গ্রামের মধ্য থেকে অশুভ শক্তিকে দূর করা–এই উদ্দেশ্য বা কামনা নিয়ে ওয়াংলা উৎসবটি করা হয়। আচার-অনুষ্ঠান এহ যে তিনটি নাচ করা হয় সেগুলো যথাক্রমে–গ্রিকা, গুড়িরুনুয়া, দানিদখ্নুয়া। গারো

উপজাতিদের এই ওয়াংলা নৃত্যটি যদিও আচার-অনুষ্ঠান মূলক নৃত্য, কিন্তু সমগ্র গারো উপজাতিদের নিকট ওয়াংলা পূজা এবং নৃত্য অনেকটা ওদের জাতীয় উৎসব হিসেবেই পরিগণিত হয়। অর্থাৎ গারো উপজাতিদের প্রধান পূজা এবং নৃত্য বলতে 'ওয়াংলা' উৎসবটি সবার মনে সর্বাগ্রে আসে। সেজন্য এই 'ওয়াংলা' নৃত্যটি পরবর্ত্তী উৎসব সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা ও বিশ্লেষন করেছি।

এছাড়া অসুস্থ ব্যক্তির রোগ নিরাময় কামনা করে বা কোন আশা আকাঙ্খা পূরনের জন্য একটি আচার-অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠানটির নাম 'নক্‌নোমিতি'। অনুষ্ঠানটি উপলক্ষ্য করে যে নৃত্যটি করা হয় তাকে বলা হয় 'গ্রাতুলি'।

গারো উপজাতিদের মধ্যে ও মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির অস্থি দাহ উপলক্ষ্যে একটি নৃত্য করা হয়। নৃত্যটির নাম 'মাংরিয়া'।

ত্রিপুরায় বসবাসরত খাসিয়া উপজাতিরা পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সেখানে যাতে কোন অশুভ শক্তি বা ভূত-প্রেতের কোন প্রকার দৃষ্টি না পড়ে সেজন্য একটি পূজা দেওয়া হয় এবং পূজা উপলক্ষ্যে নৃত্যটি করা হয়। নৃত্যটির নাম 'পাস-তি-এ'।

ওঁরাও উপজাতিদের মধ্যে কৃষির উন্নতি ও ফসল কামনায় করম পূজা করা হয়। এই পূজা উপলক্ষ্যে যে নৃত্যটি করা তাকে 'করম' নৃত্য বলা হয়।

ত্রিপুরায় প্রধান উপজাতি ত্রিপুরী সম্প্রদায় ফসল ঘরে তোলার পর পূজা করে এবং পূজা উপলক্ষ্যে নৃত্য পরিবেশন করে। জুম ক্ষেতে উৎপন্ন এক বিশেষ ধরনের ধানকে বিন্নী ধান বলে। কক্‌বরক ভাষার এই ধানের নাম মাইমি। ফসল তোলার পর মাইমি ধানের চাল 'মাইলুমা' (শস্যের দেবী) ও খুলুমা (তুলার দেবী) কে উৎসর্গ করে খাওয়া হয়। একে 'মাইকাতাল চামানি' বা নূতন ভাত খাওয়া অর্থাৎ নবান্ন উৎসব বলা হয়। এই মামিতা পূজাতে কক্‌বরক ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে মঙ্গলময় যত দেবদেবী আছেন সবার পূজা করা হয়। এই পূজার উদ্দেশ্য একই। অর্থাৎ আগামী বছরে অধিক ফসল ফলন এবং গৃহস্থ সকলের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা।

এই পূজা উপলক্ষ্যে গ্রামের যুবক-যুবতীরা আনন্দফূর্তির মাধ্যমে মামিতা পূজার প্রসাদ মদ্য ও মাংস দেবার গৃহস্বামীর কাছে তারা নানাভাবে দাবীগুলো জানায়। তারা এই দাবীগুলো নানারকম উপমা দিয়ে গানের মাধ্যমে নৃত্যদ্বারা গৃহস্বামীর কাছে উপস্থাপনা করে। একেই মামিতা নাচ বলা হয়।

আশ্বিন মাসের শেষ দিকে জুম থেকে ফসল সংগ্রহ করার পর কার্তিক মাসের প্রথম দিকে এই মামিতা উৎসব ও নৃত্য-গীত করা হয়।

ত্রিপুরী উপজাতিদের মধ্যে 'মামিতা' বা নবান্ন উৎসব প্রচলিত হলেও, এই উপলক্ষ্যে নৃত্যের প্রচলন দেখা যায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সদর অঞ্চলের একটি ত্রিপুরী গোষ্ঠী এবং খোয়াই মহকুমার একটি ত্রিপুরী সম্প্রদায় ও সদরের উত্তরাংশে অবস্থিত একটি ত্রিপুরী গোষ্ঠীর মধ্যে। যদি ও নৃত্যের উদ্দেশ্য একই, তথাপি স্থানভেদের জন্যই গানের কথা ও নৃত্যের পরিবেশনায় বিভেদ দৃষ্টি হয়।

তবে সদরের উত্তরাংশে অবস্থিত ত্রিপুরীরা মামিতা নাচটিকে ভিন্ন নামে ও অন্যদের তুলনায় একেবারে সতন্ত্রভাবে উপস্থাপনা করে।

এদের নৃত্যটির নাম 'মামিতা ওয়া মুসামো'। 'ওয়া'–বাঁশ মুসামো–নৃত্য। অর্থাৎ মামিতা বংশ নৃত্য। জুম থেকে ফসল সংগ্রহ করে আনার পর ধান মাড়াই ও ঝাড়ার পর গাইল–চিয়া দিয়ে ধান ভানা হয়। ধান ভানার সেই চাল দিয়েই মামিতা উৎসব করা হয়। উপজাতিদের জীবনে এই গাইল–চিয়া একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। ফসল উৎসবে এই গাইল–চিয়া তাদের কাছে প্রধান মাধ্যম। এই গাইল–চিয়াকে মাধ্যম করেই সদরের উত্তরাংশে অবস্থিত ত্রিপুরী সম্প্রদায়রা মামিতা উৎসবে নৃত্য পরিবেশন করত। কিন্তু ধীরে ধীরে এই 'চিয়া' ব্যবহার করে নৃত্যটি করতে কিছু কিছু অসুবিধে দেখা দিল।

অর্থাৎ দুটো 'চিয়া' পাশাপাশি মাটিতে রেখে তার উপর আড়াআড়ি ভাবে আরও দুটো চিয়া দিয়ে চারজন বসে সেগুলোকে ধরে, একটি চতুষ্কোনের মত করে মাটিতে দুবার ঠুকে, আবার দুটো পরস্পর ঠুকে তাল দিতে। এরই মাঝে পা ফেলে যুবক-যুবতীরা নৃত্য করত। কিন্তু নৃত্যটি যখন আর ও ভালোভাবে করা হল, তখনই কিছু কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হল। কারন চিয়া গুলো দৈর্ঘে ছোট এবং বেশ ভারী। কাজেই নৃত্যের গতি যখন দ্রুতলয়ে পৌঁছায়, তখন 'চিয়া' টি ভারী হওয়ার জন্য ধরে দ্রুতভাবে তাল ঠোকা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং দৈর্ঘে ছোট হওয়ার জন্য একই সঙ্গে ৬ জন অথবা ৮ জন মিলে নাচা যায় না। ফলে তারা 'চিয়ার' পরিবর্ত্তে বাঁশ দিয়ে নৃত্যটি করা শুরু করে। সেজন্য নৃত্যটির নাম দিয়েছে 'মামিতা ওয়া মুসামো' বা মামিতা বংশ নৃত্য।

নিম্নে উপজাতি ভেদে আচার-অনুষ্ঠান অথবা কামনা পূরন নৃত্যগুলো আলোচনা করা হল।

ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মামিতা নৃত্য

১ নং ভঙ্গী

যুবক-যুবতীরা এক হাতে ডালা নিয়ে ডান পায়ে পদক্ষেপ দিয়ে ৪ মাত্রার ছন্দে নৃত্যস্থলে আসে।

২ নং ভঙ্গী

যুবক-যুবতীরা মুখোপুখি নীচু হয়ে দুহাতে ডালা ধরে এক পাশ থেকে অন্য পাশে নিয়ে যায়। অর্থাৎ মামিতা পূজার জন্য উঠান পরিষ্কার করে।

৩ নং ভঙ্গী

যুবক-যুবতীরা দুটো সারিতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই হাতে ডালা ধরে একপাশ থেকে অন্যপাশে খুব জোরে আন্দোলন করতে করতে একটি সারি থেকে অন্য সারিকে অতিক্রম করে।

৪ নং ভঙ্গী

যুবক-যুবতীরা পরস্পর পরস্পরের দিকে পিছনে ফিরে পূর্বোক্ত ভঙ্গীতে ডালা আন্দোলন করে পুনরায় উঠোন পরিষ্কার করার ভঙ্গী করে।

৫ নং ভঙ্গী

নৃত্যস্থলের দর্শকদের অভিমুখী হয়ে দুই সারিতে দাঁড়িয়ে যুবক-যুবতীরা ডালা নিয়ে একই ভঙ্গী করে। (এখানে মামিতা পূজা উপলক্ষ্যে উঠোন পরিস্কার করার ভঙ্গীটি বিভিন্ন নৃত্য নকশার মাধ্যমে এরা উপস্থাপনা করে)।

৬ নং ভঙ্গী

নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় দর্পনের ভঙ্গী সাদৃশ্য

পূর্বোক্ত ভঙ্গীটি করে দুদিকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে এসে যুবক-যুবতীরা একসারি হয় এবং পুনরায় একটি বৃত্ত রচনা করে। এখানে যুবক-যুবতীরা পদদ্বয়কে যেভাবে অবস্থান করে এই ভঙ্গীটি করে, পদদ্বয়ের এই অবস্থানের সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে নৃত্যে অবস্থানের যে ৬টি ভঙ্গী দেওয়া আছে তারমধ্যে 'আলীঢ়' নামক অবস্থানের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়। আলীঢ়স্থান প্রথমে মণ্ডল স্থানে অবস্থান করার পর একটি পা থেকে অপর পা পাঁচতাল দূরে যাবে। এখানে নৃত্যশিল্পীরা পদদ্বয়ের ঠিক এইরূপ অবস্থান করে ভঙ্গীটি করে অর্থাৎ যখন ডান পাশে যায়, তখন ডান পা সমভাবে চালনা করে এবং বাঁ পা কিছুটা দূরে রেখে টেনে আনে। এছাড়া অভিনয় দর্পনে বর্নিত 'আলীঢ় মণ্ডলের' সঙ্গে ও এর সাদৃশ্য দেখা যায়)।

৭ নং ভঙ্গী –(এই ভঙ্গী থেকে গান শুরু হচ্ছে) – 'রাজা করেন দুর্গাপূজা এবং গরীবরা করে যমদূত পূজা।

যবক-যুবতীরা দুই সারিতে দাঁড়িয়ে চার মাত্রার ছন্দে একহাত সূচীমুখ মুদ্রা করে একবার সামনে দেখায়, আবার মাথার উপর একই হস্তভঙ্গী করে দুবার ঘুরিয়ে পুনরায় নীচে ঘোরায়।

৮ নং ভঙ্গী – 'ধান ক্ষেতের ঝরে পড়া ধান খাওয়ার আশায় ঢুপীরা (এবা ধরনের পাখী, যারা জুম ক্ষেতে থাকে) আনন্দে নাচ করে।

নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গী সাদৃশ্য

যুবক-যুবতীরা দুটো সারিতে ভাগ হয়ে ৪ মাত্রার ছন্দে পদক্ষেপ ফেলে একহাত কপিত্থ মুদ্রায় রেখে বার বার ধান ছিটানোর ভঙ্গী করে কোমরে ধরে লাফ দিয়ে একবার ডান দিকে বসে, একবার বাঁ দিকে বসে। (কপিত্থ মুদ্রা–নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা করতল মধ্যস্থিত এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উর্দ্ধমুখ ও তর্জনী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পীড়িত হয়ে বক্র হলে তাকে কপিত্থ হস্ত বলা হয়)।

৯ নং ভঙ্গী – 'মামিতা পূজায় সবাই নমস্কার করে'।

অভিনয় দর্পনের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

ছেলে-মেয়েরা প্রত্যেকে দুই সারিতে বসে পাশে ডালা রেখে হাত জোড় করে দেহের চারপাশে ঘুরিয়ে আনে, সেই সঙ্গে হাত ও নমস্কারের ভঙ্গীতে চারপাশে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। (এখানে এদের বসার ভঙ্গীর মধ্যে অভিনয় দর্পনে বর্ণিত পার্শ্বসূচী মণ্ডলমের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়। (পার্শ্বসূচী মণ্ডলম–পাদাগ্রদ্বয় ও জানুদ্বয় দ্বারা ভূতল স্পর্শ করে অবস্থান করলে সেই অবস্থানকে পার্শ্বসূচী মণ্ডলম বলা হয়। এখানে এই ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীরা ও জানু দুটো মাটিতে স্পর্শ করে, দু পায়ের অগ্রভাগ মাটিতে রেখে হাত 'অঞ্জলি মুদ্রা' করে ভঙ্গীটি করে। অঞ্জলি হস্ত–পতাকা হস্তদ্বয় { পতাকা–যে হস্তের অঙ্গুলী সমূহের অগ্রভাগ প্রসারিত ও অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত হয়, তা পতাকা নামে কথিত } সংশ্লিষ্ট হলে অঞ্জলি হস্ত বলা হয়)।

১০ নং ভঙ্গী –'অতিথি, অচাই, বারুয়া, গৃহকর্তা, গৃহকত্রী ইত্যাদি সবাইকে মাংস ভাগ করে দাও। (এখানে গানের এই কথা গুলোর সঙ্গে একই ভঙ্গী বিভিন্ন নৃত্যনকশার মাধ্যমে উপস্থাপনা করে)।

যুবক-যুবতীরা এক সারি হয়ে এক হাত উত্থান অবস্থায় রেখে, তার উপর ডালা নিয়ে এক পাশে ঘুরিয়ে এনে অপর হাত কপিত্থ মুদ্রা করে ডালা থেকে মাংস নিয়ে ছিটিয়ে দেওয়ার ভঙ্গী করে। ডালাটি একবার ডান হাতে ঘোরায়, আবার বাঁ হাতে ঘোরায়।

এই ভঙ্গীটি একবার বৃত্তাকারে ঘুরে করে। আবার দুটো সারিতে ভাগ হয়ে ভঙ্গীটি করে। পুনরায় দর্শকদের অভিমুখে একটি লম্বা লাইন করে দাঁড়িয়ে একইভাবে ডালা পিছন দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে।

১১ নং ভঙ্গী

নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

দুটো সারি পরস্পর মুখোমুখি হয়ে ডালা ঘোরাতে ঘোরাতে একে অন্যকে অতিক্রম করে এবং মাংস দেওয়ার ভঙ্গী করে। (ডালা যখন পিছন দিকে ঘুরিয়ে আনে তখন পার্শ্বক্রিয়া 'বিবর্ত্তিত' ও 'অপসৃত' ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়। বিবর্ত্তিত– মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ ঘোরান এবং অপসৃত–বিবর্ত্তিত অবস্থা থেকে পার্শ্বদেশ অপনীত হলে হয় অপসৃত)

১২ নং ভঙ্গী 'উঠোনের চারপাশে মশার জন্য অতিথিরা কেউ বসতে পারছেনা। অতএব উঠোন পরিষ্কার কর।'

যুবক-যুবতীরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই হাতে ডালা ধরে একপাশ থেকে অন্যপাশে সঞ্চালন করে অর্থাৎ উঠোনে বাতাস দিয়ে মশা তাড়াবার ভঙ্গী করে এবং সেই সঙ্গে এক পা সম অবস্থায় রেখে চালনা করে অন্য পা টেনে নিয়ে যায়।

১৩ নং ভঙ্গী 'তোমার কাছে হাঁস ও চাইনা, মোরগ ও চাইনা। শুধু মদ চাই'।

দুই সারিতে দাঁড়িয়ে নীচু হয়ে দুটো হাত শিথিল ভাবে রেখে বাঁ পাশ থেকে সঞ্চালন করে ডান নিয়ে যায়। আবার একই ভাবে বাঁ পাশে নিয়ে যায়।

১৪ নং ভঙ্গী – 'মা-বাবাকেও পূজার প্রসাদ দাও'

ছেলে মেয়েরা এক সারি হয়ে ডালা হাতের নীচে রেখে সেই হাতের উপর অন্য হাতে তালি দিয়ে চার মাত্রার ছন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে।

১৫ নং ভঙ্গী – 'অন্য কিছু চাইনা। ঘরের ভিতর বোতল রাখা আছে। শুধু ঐ জিনিসটা চাই'

একহাতে সুচীমুখ মুদ্রার মত করে ছেলে-মেয়েরা বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে একবার ডান পাশে নির্দেশ করে। আবার বাঁ পাশে নির্দেশ করে।

১৬ নং ভঙ্গী – 'গৃহকর্তার বাড়ীতে ১২টি ঘর আছে। সব ঘরে ঢুকে মদ্যপান করে আনন্দে নাচব'

ডালা নিয়ে দ্রুত লয়ে চার মাত্রার ছন্দে পা ফেলে বৃত্তাকারে ঘুরে যুবক-যুবতীরা নৃত্যস্থল পরিত্যাগ করে।

মামিতা ওয়া মুসামো

যুবক-যুবতীরা ৬টি বাঁশ নিয়ে নৃত্যস্থলে এসে তিনটি বাঁশ মাটিতে লম্বা করে রেখে তার উপর আড়াআড়ি ভাবে আর তিনটি বাঁশ রেখে দুবার বাঁশগুলো মাটিতে ঠুকে, দুবার বাঁশে বাঁশ ঠুকে তাল দিতে থাকে। এরই মাঝে পা ফেলে ৬ জন অথবা ৮ জন যুবক-যুবতী বিভিন্ন ছন্দে, বিভিন্ন নৃত্য নকশা তৈরী করে নাচতে থাকে।

এই বাঁশ নৃত্যের মধ্যে হরিনের চলার ছন্দকেই অনুসরন করে এরা উপস্থাপনা করে। বাঁশ ঠোকার তালে তালে যুবক-যুবতীরা যখন হাতে লেবাংতি যন্ত্রটা নিয়ে এক সারিতে এসে বাঁশের মধ্যে পা ফেলে নৃত্য শুরু করে তখন মনে হয় ঠিক যেন এক সারি হরিন পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে আসছে এবং তখন হরিনদের চলার মধ্যে যে ধরনের ছন্দ থাকে ঠিক সেইরূপ ছন্দে পদক্ষেপ নিয়ে নৃত্য শুরু করে। নৃত্য শিল্পীদের হাতে 'লেবাংতি' নামের যন্ত্রটি সাধারনত : লেবাংবুমানি নৃত্যে ব্যবহার করা হয়। এখানে এই যন্ত্রটি বাজিয়ে নৃত্য করার কারন হচ্ছে হরিনদের দেহে যে ছন্দ, সে ছন্দ ও তাল নৃত্যশিল্পীদের দেহে রক্ষা করার জন্যই যন্ত্রটি বাজিয়ে নৃত্যটি করা হয়। এছাড়া নৃত্য চলাকালীন পায়ের ছন্দে যন্ত্রটি যখন বাজান হয়, তখন হরিনের পায়ের খুড়ের শব্দের সঙ্গে এই যন্ত্রের শব্দের সঙ্গে একটি সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। এই যন্ত্রটি বাজাতে বাজাতে বাঁশে তাল ঠোকার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন প্রকারের পদক্ষেপ দিয়ে নৃত্য নকশা (Dance pattern) করে নাচে।

১ নং ভঙ্গী

যুবক-যুবতীরা প্রত্যেকটি বাঁশের কোনায় দাঁড়িয়ে দুই হাতে লেবাংতি যন্ত্রটি ধরে উপরে তুলে বাজিয়ে বৃত্তাকারে বাঁশের ঠোকার ফাঁকে পদক্ষেপ দিয়ে ঘুরতে থাকে।

২ নং ভঙ্গী

যুবক-যুবতীরা পরস্পর পরস্পরের বিপরীতমুখী হয়ে হাতের যন্ত্রটি নীচে বাজিয়ে বৃত্তাকারে ঘোরে। অর্থাৎ ছেলেরা যখন অন্তভ্রমরী করে তাল দেয়, মেয়েরা তখন বাহ্য ভ্রমরী করে তাল দেয়।

৩ নং ভঙ্গী

নীচুতে তাল বাজাতে বাজাতে দুজন যুবক ও দুজন যুবতী বাঁশের মধ্যে একেবেঁকে পরস্পর পরপস্পরকে অতিক্রম করে। (এই ভঙ্গীটিতে দেহে যে ছন্দ ও পায়ের তালের যে গতি তাতে মনে হয় হরিন দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে)।

৪ নং ভঙ্গী

যুবক-যুবতীরা যারা বাঁশগুলো ঠুকে তাল দিচ্ছিল, ওরা বাঁশগুলোকে পূর্বের মত আড়াআড়িতে রেখে উপরে তুলে ফেলে এবং এই বাঁশগুলোর উপর একটি যুবক দাঁড়িয়ে হাত উপরে তুলে লেবাংতি যন্ত্রটি বাজাতে থাকে। যুবক-যুবতীরা বাঁশশুদ্ধু ঐ যুবকটিকে উপরে তুলে বাঁশগুলো নিয়ে বৃত্তাকারে ঘোরে। (এই ভঙ্গীটিতে নৃত্যশিল্পীদের ভারসাম্যতার অপূর্ব নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। পূর্বে এই মামিতা ওয়া মুসামো নাচটিতে শুধু মেয়েরা অংশ গ্রহন করত। কিন্তু যখন এদের নাচে আধুনিকতার ছোঁয়াচ আনার চেষ্টা হল, তখনই নৃত্যে সৌন্দর্য্য রক্ষার প্রয়াসে নানাবিধ নৃত্য নৈপুন্য সৃষ্টি করা হয় এবং এই নৈপুন্যে দৈহিক শক্তির প্রয়োজন হল, তখনই এই নৃত্যে পুরুষরা ও অংশ নিতে শুরু করে।)

৫ নং ভঙ্গী

দুজন যুবক, দুজন যুবতী একহাত কোমরে ধরে অপর হাতে লেবাংতি যন্ত্রটি নিয়ে উপরে তুলে আড়াআড়ি ভাবে একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে খুব দ্রুতভাবে একবার চলে গিয়ে পুনরায় একই ভঙ্গীতে নিজের জায়গায় চলে আসে।

৬ নং ভঙ্গী

দুহাতে লেবাংতি যন্ত্রটি নিয়ে উপরে তুলে খুব দ্রুতলয়ে যুবক-যুবতীরা লাফিয়ে লাফিয়ে বৃত্তাকারে দৌড়াতে থাকে। অর্থাৎ হরিনরা যেমন বাঘের গন্ধ পেয়ে প্রানের

ভয়ে ছুটতে থাকে, তেমনি এরা ও হরিনের মতই দ্রুতলয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরতে থাকে। এই ভঙ্গীটি করার সময় 'খামে' খুব দ্রুতলয়ে তাল বাজাতে বাজাতে হঠাৎ করেই থেমে যায়। তখন যুবক-যুবতীরা বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে দেহকে ঈষৎ সামনে ঝুঁকিয়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে পরে। (অর্থাৎ একদল হরিন পূর্বেই ছুটে চলে গেছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক দল আলাদা হয়ে গেছে। তাই অন্যদের জন্য এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক লক্ষ্য করে দেখছে যে অপর দল কোথায় গেছে) এরপর বৃত্তাকারে ঘুরে নৃত্যস্থল পরিত্যাগ করে।

এখানে সমগ্র নাচের মধ্যেই ডান ও বাঁ পা পর্যায়ক্রমে পায়ের অগ্রভাগের উপর রাখে এবং সমভাবে পদদ্বয় রেখে ছোট করে লাফানোর ভঙ্গী করে অর্থাৎ হরিনের ন্যায় গতিভঙ্গীর অনুকরন করে। এই ভঙ্গীটি করার সময় এখানে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত উরুর ক্রিয়া 'কম্পনের' প্রয়োগ দেখা যায়। (কম্পন–বারংবার গোড়ালীর উন্নামন ও অবনামন)

এই নৃত্যটির সঙ্গে মিজো উপজাতিদের 'চেরো' নৃত্য বা বাঁশ নৃত্যের (চেরো নৃত্য সম্বন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে) খুবই সাদৃশ্য দেখা যায়। তাই নৃত্যটি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। এই নৃত্যটির আঙ্গিকে মিজো উপজাতিদের 'চেরো' বা বাঁশ নৃত্যের প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। ত্রিপুরায় মিজো উপজাতিদের 'চেরো' নৃত্যটি গত ৩০/৪০ বছর ধরে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং খুবই জনপ্রিয়। হঠাৎ করেই 'মামিতা ওয়া মুসামো' নৃত্যটি দেখলে মনে হয় বাঁশের মধ্যে দিয়ে নৃত্যের পরিকল্পনা মিজো উপজাতিদের 'চেরো' নৃত্য থেকে নেওয়া হয়েছে। তবে একথা বলা যায় যে শুধু মাত্র বাঁশের ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে নৃত্যের সঙ্গেই শুধু মিজোদের 'চেরো' নৃত্যের সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু ভঙ্গীগুলো সবই এই ত্রিপুরী সম্প্রদায়টির স্বতন্ত্র।

যেখানে মিজো মেয়েরাই শুধু বাঁশের মধ্যে নৃত্য করে সেখানে এই ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীরা উভয়ে মিলে নাচটি করে। চেরো নাচে হাতের কোন ভঙ্গী নেই। কিন্তু এই মামিতা নাচে হাতের লেবাংতি যন্ত্রটি নিয়ে নানা প্রকার ভঙ্গী করতে দেখা যায়। চেরো নাচের নৃত্য নকশা থেকে এদের নৃত্য নকশা সম্পূর্ন আলাদা। চেরো নাচে মেয়েদের চলার ভঙ্গীর মধ্যে খুবই নমনীয়তা অর্থাৎ লাস্যাঙ্গের ভঙ্গীর প্রয়োগ দেখা যায় এবং খুবই হালকা পদচালনা (Light stepping) করে। কিন্তু মামিতা নাচে যুবক-যুবতীদের পদচালনাতে কিছুটা তাণ্ডাবাঙ্গের ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ হরিনের লাফিয়ে যাওয়ার গতিকেই নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করছে। এই মামিতা নাচের মধ্যে যখন খুব দ্রুত তালে

বাঁশের ফাঁকে ফাঁকে নাচটি হতে থাকে তখন প্রচণ্ড উদ্দামতা এদের নাচে লক্ষ্য করা যায় যা মিজোদের নাচে অনুপস্থিত। বিশেষ করে একটি ছেলেকে বাঁশের উপরে রেখে যেভাবে বাঁশগুলো ধরে ঘোরাতে থাকে তা এককথায় অনবদ্য। এই ধরনের নৈপুন্যতা চেরো নাচে দেখা যায় না।

রিয়াং উপজাতিদের মৃত্যুর পর পাঁচটি পর্যায়ে আচার-অনুষ্ঠানমূলক নৃত্য

রিয়াং উপজাতিদের মৃত্যুর পর পাঁচটি পর্যায়ে যে আচার-অনুষ্ঠান করা হয় তাতে প্রথম পর্যায় হচ্ছে 'সামফ্লিং বাচামি'। সামফ্লিং-ছায়া, বাচামি-দাঁড়ানো।

রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃত্যুর পরে সেই মৃতদেহকে ঘরের মধ্যে রেখে মৃত ব্যক্তির পায়ের কাছে জুমে উৎপন্ন বিভিন্ন ফসল রেখে দুজন পুরুষ সারারাত ধরে নাচতে থাকে। মাথায় পাগড়ী বেঁধে, ধুতি পরে হাতে রিওয়াসা (তাঁত বোনার যন্ত্র) নিয়ে নৃত্যটি করে। অর্থাৎ অশুভ শক্তি মৃত ব্যক্তির আত্মাকে নরকে যাতে নিয়ে যেতে না পারে সেজন্য অশুভ শক্তির সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে। হাতের রিওয়াসা যন্ত্রটি তলোয়ারের প্রতীক।

নৃত্য বর্ণনা ও বিশ্লেষন

নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

এই নৃত্যটিতে একটি ছেলে কোমর রেচিতা ভঙ্গীতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। (রেচিতা-নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত কটি ভঙ্গীর মধ্যে রেচিতা কটিভঙ্গী অন্যতম। বৃত্তাকারে ঘোরাকে 'রেচিতা' বলে।) দুহাত সব সময় 'আবেষ্টিত' ও 'উর্দ্‌বেষ্টিত' অবস্থায় ঘুরিয়ে নাচ করে। কখন ও এক হাত, কখন ও দুহাত ঘোরায়। আবার কখন ও দুহাত দুপাশে রেখে একবার ডান পাশে বেঁকিয়ে হাত ঘুরিয়ে আনে এবং বাঁ পাশে ও একই প্রকার করে। (আবেষ্টিত যখন সমস্ত আঙ্গুলগুলি অর্থাৎ প্রথমে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে ভিতর দিয়ে নিয়ে আসা হয়। উদবেষ্টিত–ঠিক একই প্রকার। শুধু আঙ্গুলগুলো ভিতর দিকে না রেখে বাইরের দিকে লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং একই সময়ে হাতটা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে)। অপর ব্যক্তি একই 'রেচিতা' ভঙ্গীতে কোমর ঘুরিয়ে হাতে 'রিওয়াসা' যন্ত্র (কোমর তাঁত) নিয়ে চারদিকে তলোয়ার চালাবার ভঙ্গীতে ঘোরাতে থাকে। এই সময় পা দুটো মাটিতে রেখে না উঠিয়ে একবার ডান পাশে ঘুরিয়ে, আবার বাঁ পাশে ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। পায়ের ভঙ্গীটিতে নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত 'অঞ্চিত'

ভঙ্গীর প্রয়োগ দেখা যায়। (অঞ্চিত–গোড়ালী ও পায়ের অগ্রভাগ ভূমিতে স্থাপন করে অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত করলে অঞ্চিত বলা হয়। এই অঞ্চিত ভঙ্গী কথাকলি নাচের পাদকর্মে দৃষ্ট হয়)।

নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গী সাদৃশ্য

হাতে রিওয়াসা যন্ত্র নিয়ে যে ব্যক্তি নাচটি করে তার ভাবভঙ্গীতে বীর রসের প্রাধান্য দেখা যায়। চোখ উপরে তুলে, সামনে, ডানদিকে, বাঁদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে যেন অদৃশ্য যমদূতকে দেখছে–এইরূপ ভাব করে। সারারাত ধরে একই ভঙ্গীতে এরা নেচে যায়।

দ্বিতীয় পর্যায় 'কুথেনাইম'। 'কুথেনাইম-শ্রাদ্ধ। অর্থাৎ শ্রাদ্ধ বাসরের নাচ। মৃত ব্যক্তির অস্থি ৫/৬ মাস পরে বিসর্জন দেওয়া হয়। সেই সময় বিসর্জনের পূর্ব রাত্রিতে ঘরের বারান্দায় অস্থি রেখে সারারাত ওরা নাচ ও গান করে। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শেষ শ্রদ্ধা স্বরূপ এই নৃত্য করা হয়

এই নৃত্যটিতে ও একই প্রকারের হস্তভঙ্গীতে পদচালনা করা হয় দুজন পুরুষ কোমর 'রেচিতা' অবস্থায় ঘুরিয়ে হাঁটু বাঁকিয়ে নাচতে থাকে। কখন ও হাত দুটো 'অলপদ্ম' মুদ্রায় রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, দেহ ডান পাশে ও বাঁ পাশে সঞ্চালন করে ধীরে ধীরে হাঁটু মুড়ে নাচতে থাকে। মেয়েরা পূর্বের মতই এক হাত ঘুরিয়ে বা দুই হাত ঘুরিয়ে নাচতে থাকে। (অলপদ্ম হস্ত যার অঙ্গুলীগুলি করতলে আবর্ত্তিত, পার্শ্বস্থিত ও বিশিষ্ট হয়)।

তৃতীয় পর্যায়–'তায়ীখাম্রমি'। 'তাওখা'–কাক, 'মুরামি'–পাহারা দেওয়া। মৃত ব্যক্তির অস্থি নদীতে বিসর্জনের পূর্বে নদীর তীরে একটি ঘর তৈরী করে একদল সেখানেই থাকে। অপর দল বাড়ীতে চলে আসে। সেখানে মৃত ব্যক্তির অস্থি বিসর্জন উপলক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে শ্রাদ্ধ করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে ঘরটির মধ্যে খাবার এবং অন্যান্য জিনিষ থাকে। এগুলোর লোভে প্রচুর কাক আসে। কাজেই কাকগুলোকে তাড়াবার জন্য খাম্ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সবাই মিলে নাচতে থাকে। নৃত্যের ভঙ্গী একই প্রকার।

চতুর্থ পর্যায় 'লামচাকমি'–'লাম'-রাস্তা, 'চাকমি'-জমায়েত হয়ে নাচা। অস্থি বিসর্জন দিয়ে তীর থেকে বাড়ীতে পৌঁছানোর পূর্বে নাচতে থাকে। এর নাম 'লাম চাকমি'।

পঞ্চম পর্যায়–অস্থি বিসর্জনের পরদিন সবকিছু ধুয়ে বাড়ী শুদ্ধ করে গঙ্গা পূজা করে। তখন সবাই স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নৃত্য করে। এই পর্যায়ের নাম 'নোকসার খেমি'। অর্থাৎ ঘর শুদ্ধ করা। এদের নাচের ভঙ্গী সব একই প্রকার।

মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে অস্থি বিসর্জন দিয়ে ঘরে পৌঁছান পর্যন্ত নৃত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে নৃত্য-গীত করে শেষ বিদায় দেওয়া, শ্রদ্ধা জানানো। ইহ জগতের সুখ এখানেই শেষ। তাই শেষবারের মত মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নৃত্য-গীত করা।

হালাম উপজাতিদের লক্ষ্মী পূজা বা 'সাপিতেদয়' উপলক্ষ্যে নৃত্য

হালাম উপজাতিদের ধান ঘরে নিয়ে আসার পর লক্ষ্মী পূজা বা 'সাপিতেদয়' অনুষ্ঠান করা হয়। কলাগাছের গোড়ার দিকের একটি অংশ কেটে এনে, ৩/৪টি বাঁশের কঞ্চি এর মধ্যে বসিয়ে একটি কাঠামো তৈরী করে পূজা করে। পূজার পর দুজন যুবক পা পর্যন্ত আচকানের মত গায়ে জড়িয়ে নাচতে থাকে। এই সময় এরা তিন প্রকার নাচ পরিবেশন করে। যথা–ভায়লম, আরখন আনচু (মুরগীর লড়াই) এবং সাপিতেলা (লক্ষ্মী পূজার প্রধান নাচ)।

ভায়লম

দুজন যুবক আচকানের মত পোষাক পরে মাথায় পাগড়ী বেঁধে এক হাত কোমরে ধরে এবং অন্যহাত উপরে তুলে ডাইনে, বাঁয়ে আন্দোলন করে জোড়পায়ে লাফিয়ে দ্রুতলয়ে নাচতে থাকে। এর নাম 'ভায়লম'।

আরথন আনচু

উপরোক্ত ভঙ্গীটি পরিবর্তন করে পুরুষ দুজন কোমরে ধীরে শরীরকে বাঁ পাশে বাঁকিয়ে দুজন দুজনের প্রতি জোড় পায়ে লাফিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে অগ্রসর হতে থাকে। যখন মুখোমুখি হয় তখন দুজনেই তীব্রগতিতে একটি লাফ দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করে দূরে চলে যায়। আবার ডান পাশে শরীর বাঁকিয়ে কোমরে ধরে একই ভঙ্গীতে অগ্রসর হতে থাকে। অর্থাৎ পুরুষ দুজনের মধ্যে একজন ওঝা ও অপরজন তার সহকারী। লক্ষ্মীপূজা চলাকালীন গ্রামের মধ্যে অশুভ শক্তিকে দূর করবার জন্য লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে ঘুরে এক হাত দিয়ে নানাপ্রকার ভঙ্গী করে। এরপরের ভঙ্গীতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আক্রমণাত্মক ভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং পিছিয়ে আসছে। অর্থাৎ অশুভ শক্তি অথবা খারাপ আত্মার বিরুদ্ধে লড়াই করে গ্রাম থেকে দূর করার চেষ্টা করছে।

সাপিতেলা

শেষ পর্যায় 'সাপিতেলা'। এই পর্যায়ে একজন মহিলা ডান পা টেনে শুধু বাঁ পা দ্বারা তাল দিয়ে, এক হাতে থালা নিয়ে, থালা থেকে ফুলের পাপড়ী ছড়িয়ে দিয়ে

নৃত্যস্থলে আসে এবং পিছনে একজন যুবক পূর্বের মত পোষাক পরে, একহাত কোমরে রেখে অন্যহাত উপরে ঘোরাতে ঘোরাতে যায় অর্থাৎ পিছনের যুবকটি হাতের ও দেহের নানাপ্রকার ভঙ্গীর সাহায্যে অশুভ শক্তিকে তাড়াতে চায় এবং মেয়েটি পূজার আশীর্বাদ ফুল গ্রামের চারপাশে ছড়িয়ে দেয় যাতে গ্রাম থেকে এই অশুভ আত্মা দূরে চলে যায়।

কুকী উপজাতিদের থাইডর নৃত্য

কুকী সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তার শ্রাদ্ধ বা পারলৌকিক কর্ম করা হয় না। কয়েকমাস অপেক্ষা করা হয়। যতদিন ওদের সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃতের সংখ্যা না বাড়ে ততদিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তির পারলৌকিক কাজ বন্ধ থাকে। ৭/৮ জন ব্যক্তির মৃত্যুর পর একদিন সবাই মিলে ভোজ দিয়ে গ্রামের সবাইকে আপ্যায়িত করে। এই উৎসবটিকে 'থাইডর' উৎসব বলা হয়। ভোজ সমাপনান্তে একজন ছেলে এবং একটি ছেলে মেয়ে সেজে গ্রামের প্রতিটি বাড়ীর সম্মুখস্থ খোলা অঙ্গনে গিয়ে নাচ করে। এই নৃত্যটিকেও 'থাইডর' বলে। (পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বর্তমানে কুকী উপজাতিরা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ফলে এদের এইসব আচার-অনুষ্ঠান এখন করা হয় না। কিন্তু নাচটির বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করার সুবিধার্থে এদের পারলৌকিক আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বলা হল।

থাইডর নৃত্য

মৃত ব্যক্তিদের বাড়ীতে গিয়ে এই নৃত্যটি করা হয়। নৃত্যটির প্রারম্ভে একটি বল্লম বাড়ীর উঠোনের মাঝখানে গেঁথে রাখে। প্রথমে একটি ছেলে মেয়ের সাজে সজ্জিত হয়ে বসে বসে লাফিয়ে হাততালি দিয়ে বল্লমটির চারপাশে ঘুরে চলে যায়। অপর যুবকটি ডানহাতে দাঁ নিয়ে দুপাশে ঘুরিয়ে নাচতে থাকে। নাচের সময় পা কখনও মাটি থেকে উপরে তোলেনা। সবসময়ই প্রায় ভূমি স্পর্শ করে থাকে। দুই মাত্রার ছন্দে মাটিতে পা ঘষে ঘষে ডান হাতে শূন্যে দা চালিয়ে দেহ এঁকে বেঁকে নাচটি করে। এরপর দা পিঠের উপর রেখে বসে বসে একই পদসঞ্চালন করে হাত ঘুরিয়ে, সেইসঙ্গে দেহকে নানাভাবে মোচড় দিয়ে নাচতে থাকে। একসময় মাথা নীচু করে দেহ বাঁকানোর সাথে সাথে দা মাথার উপর দিয়ে চলে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতে দা ধরে সম্মুখস্থ জায়গায় মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে একটি কোপ দেয়।

মৃত ব্যক্তিদের আত্মার কু-দৃষ্টি বা প্রেতাত্মার প্রকোপ যাতে না পড়ে সেজন্য মৃত ব্যক্তিদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে দেবতার প্রতীক বল্লম রেখে নৃত্যটি করা হয়। বল্লমটি

এখানে অনেকটা অপদেবতার হাত থেকে পরিবারের লোকদের রক্ষা করার জন্য নিরাপত্তা বা Safe guard হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

নৃত্যটির প্রথমে যুবকটি ধীর লয়ে শুধু হাত ঘুরিয়ে নৃত্য–প্রেতাত্মা তাড়াবার জন্য শুধু হাতে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করা বা প্রেতাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করছে এই ভঙ্গীটিই নৃত্যের মধ্যে ফুটে ওঠে। এরপর দ্রুতলয়ে দা হাতে নিয়ে নাচা অর্থাৎ প্রেতাত্মার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং চরম মুহূর্তে পৌঁছাবার পূর্বে দা পিঠের উপর রেখে নেচে, মাথার উপর দিয়ে দাঁ নিয়ে এসে মাটিতে কোপ্ দেওয়া–অর্থাৎ অপদেবতা বা প্রেতাত্মা বধ করা। এইভাবে নৃত্যটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

চাকমা উপজাতিদের থানমানা নৃত্য

থানমানা পূজা হচ্ছে স্থান দেবতার পূজা। 'স্থান' শব্দকে চাকমা ভাষায় 'থান' বলা হয়। থান-মানা অর্থে–'স্থানকে পূজা করা'। গ্রামের সকলকে নিয়ে প্রত্যেক বাড়ী থেকে চাঁদা তুলে সম্মিলিতভাবে এই পূজা করা হয়। এই পূজা নদীর তীরে হয়। ত্রিপুরায় বসবাসরত চাকমা উপজাতিরা এই পূজাকে গাং-পূজা বা গঙ্গা পূজাও বলে।

পূজা পদ্ধতি

চৈত্র সংক্রান্তির পর বৈশাখ মাসেই এই পূজা করা হয়।

থানমানা পূজাতে বাঁশ কেটে ছোট ছোট তিনটি অথবা চার টুকরো করে বাঁশ মাটিতে পুঁতে বা কলাগাছ কেটে তারমধ্যে বাঁশের কঞ্চি বসিয়ে নানারঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে সাজানো হয়। আবার কখনও সুতোতে তুলো বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়।

এই পূজার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে অশুভ যা কিছু আছে তা দূর হয়ে সবার শুভ হোক অর্থাৎ গ্রাম বা সমাজের মঙ্গল কামনা।

থানমানা নৃত্য

থান-মানা নৃত্যে সাধারণতঃ মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। মেয়েরা এক সারিতে নৃত্যস্থলে এসে একটি চতুষ্কোন করে দাঁড়ায় এবং হাত জোড় করে বৃত্তাকারে ঘুরে এসে পূজায় জায়গায় হাঁটু ভেঙ্গে প্রণাম করে। (প্রণামের ভঙ্গীটি মণিপুরী নৃত্যে প্রদর্শিত প্রণামের ভঙ্গীর মত) এরপর নৃত্য শুরু হয়। নৃত্যে বেশীরভাগ হাততালি দিয়ে ভঙ্গী করে। পূজার ফুল দেওয়ার ভঙ্গীর সময় 'পদ্মকোষ' মুদ্রার ব্যবহার করে।

নৃত্যটি মধ্যলয়ে এবং খুবই সরল ও ভক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপনা করা হয়। (পদ্মকোষ মুদ্রা–করতল সমভাবে না থেকে কুঞ্চিত হবে। অঙ্গুলীগুলি ফাঁক ফাঁক অবস্থায় সামান্য বক্রভাবে নিম্নমুখী অবস্থায় থাকলে পদ্মকোষ হস্ত বলা হয়।)

মগ উপজাতিদের ফোরারিখো এবং পেদেসা বা পেসেঃ য়ে আকা

মগ উপজাতিরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাদের পূজা-পার্বন, আচার-অনুষ্ঠান, লোক বিশ্বাস সব কিছুই বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বুদ্ধদেবের পূজাকেই মগ সম্প্রদায়রা ক্যাং পূজা বলে।

এই পূজাতে সকলেই ভগবান তথাগতের চরণ যাচনা করে এবং ভগবান বুদ্ধের কাছে তারা এই কামনা করে যে সবাই যেন ইহলোক এবং পরলোক–এই দুই জায়গাতেই সুখে স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে।

ক্যাং পূজা উপলক্ষ্যে মগ সম্প্রদায়রা ফোরারিখো বা বুদ্ধের বন্দনায় নাচ করে।

'ফোরা-বুদ্ধ, রিখো-বন্দনা। এই নাচ বিশেষ বিশেষ পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। যেমন বৈশাখীপূর্ণিমা, আষাঢ়ের পূর্ণিমা, লক্ষ্মীপূর্ণিমা ইত্যাদি দিনগুলিতে বিশেষভাবে বুদ্ধের বন্দনা ও নাচ করা হয়।

এই নৃত্যটিতে আঙ্গিকের কোন বিশেষত্ব নেই। দুই সারিতে ছেলেমেয়েরা এসে সবাই হাত জোড় করে হাঁটু ভেঙ্গে বসে গান করে। আবার কখনও ধীর লয়ে বৃত্তাকারে হাতজোড় করা অবস্থায় ঘুরে ঘুরে বুদ্ধের বন্দনা গান করে।

মগ সম্প্রদায়ের মধ্যে কল্পতরু উৎসব করা হয়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই কল্পতরু উৎসব পালন করা হয়। কোন একটি বড় গাছকে কল্পতরু হিসেবে ঐ গাছটির পূজা দেওয়া হয় এবং নিজেদের মূল্যবান কোন জিনিষ সেই কল্পতরু উৎসবে দান করেন। অন্যান্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মত মগ উপজাতিরাও পরজন্মে বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে যে এই কল্পতরু উৎসবে দান করলে পরজন্মে সবদিক দিয়েই সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়–এই কামনা নিয়েই কল্পতরু উৎসব উপলক্ষ্যে "পেসেঃয়ে আকা' এবং "পেদেসা আকা" নৃত্য করা হয়।

'পেসেঃয়ে'–কল্পতরু। 'পেদেসা'–নিধিকুম্ভ, আকা–নাচ। এই দুটি শব্দের অর্থ যদিও দু'রকম। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য একই। একটি হচ্ছে কল্পতরু উৎসবের নাচ এবং অপরটির নিধিকুম্ভ নাচ। 'নিধিকুম্ভ' এই নাচের নাম নিয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

এই কল্পতরু উৎসবকে 'পেদেসা' বা নিধিকুম্ভ বলার কারণ হচ্ছে যে পঞ্চপাণ্ডব বনে থাকাকালীন দুর্বাসা মুনি তার সহস্রাধিক শিষ্য নিয়ে পঞ্চপাণ্ডবের অতিথি হয়েছিলেন। সেই সময় দ্রৌপদীর নিকট খাবার কিছুই ছিলনা। শুধুমাত্র কুম্ভ বা হাঁড়ির মধ্যে একটু শাক ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই কণামাত্র শাক খেয়ে কৃপাবলে দুর্বাসা ও তাঁর সহস্রাধিক শিষ্যের পেট ভরিয়ে দেন। ঠিক সেইরূপ কল্পতরু উৎসবে কণামাত্র দান করলে পরজন্মে অনেক বেশী হয়ে ফিরে আসে। এই কল্পতরু হচ্ছে দ্রৌপদীর কুম্ভ বা হাঁড়ির মত এবং 'নিধি' অর্থাৎ ধনদৌলত কণামাত্র দান করলেই সেটা পরজন্মে বিপুলভাবে ফিরে আসে।

'পেসেঃয়ে আঁকা' নৃত্যটি করার সময় একটি কল্পতরু গাছকে এঁকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে মাঝখানে রেখে তাকে প্রদক্ষিণ করা হয়। ডান পায়ে পদক্ষেপ দিয়ে দুই মাত্রার ছন্দে হাততালি দিয়ে ডান পাশে ঘোরে। পুনরায় একইভাবে বাঁ পাশে ঘোরে। নৃত্যটিতে অন্য কোন ভঙ্গী বৈচিত্র্য নেই।

পেদেসা আঁকা নৃত্যের সময়ও নৃত্যস্থলে একটি কল্পতরু গাছ এঁকে সুসজ্জিত করে রাখা হয়। ছেলেমেয়েরা প্রথমে হাতজোড় করে গাছটিকে প্রদক্ষিণ করে।

২ নং ভঙ্গীতে দুই হাত উপর থেকে সঞ্চালন করে এনে হাতে তালি দেয়।

৩ নং ভঙ্গীতে উভয় পাশে তালি দিয়ে সামনে তিনবার তালি দিয়ে বৃত্তাকারে ঘোরে। এইভাবেই নৃত্যটি একসময় শেষ হয়।

এই নৃত্যটির মধ্যে যখনই একটি ভঙ্গী থেকে অন্য ভঙ্গীতে পরিবর্তিত হচ্ছে, তখনই ঢোল বাদ্যের তালের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, অর্থাৎ নৃত্যের তালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যভঙ্গীরও পরিবর্তন হয়।

গারো উপজাতিদের 'গ্রাতুলি' নৃত্য ও 'মাংরিয়া' নৃত্য

গারো উপজাতিদের মধ্যে কোন অসুখ-বিসুখ নিরাময়ের জন্য বা কোন কামনা পূরণের জন্য এই পূজার আয়োজন করা হয়। গারো উপজাতিদের মধ্যে কেউ যদি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তার অসুখ নিরাময় কামনা বা কোন কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মানত করা হয়। এই মানত অনুযায়ী পূজা করে, তাতে মোরগ, পাঁঠা ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। এই পূজার দেবতা হচ্ছেন 'থাকতারা' বা শিব।

এই পূজাতে উঠোনের এক কোনে জালি বেঁতের পাতা দিয়ে বাঁশের মধ্যে ঝরোকা তৈরী করে এরমধ্যে ডগা সহ একটি বাঁশ রেখে পূজা করে। 'কামাল' (গারো

পুরোহিত) খুব জোরে জোরে মন্ত্রোচ্চারণ করে পূজা করতে থাকে। পূজার মধ্যে যেমন ফুল দেবতার পায়ে অর্পণ করা হয়, তেমনি মোরগের ঝুঁটি পূজাতে উৎসর্গ করা হয়। একদিন একরাত্রি ধরে পূজা চলতে থাকে। প্রাচীন উপজাতিদের মধ্যে যেমন ম্যাজিক বা যাদু বিশ্বাস প্রচলিত আছে, গারোদের এই নৃত্যটিও যাদু বিশ্বাসের ধারণা থেকে সৃষ্ট।

গারোদের ওঝা কামাল পূজা চলাকালীন একসময় উঠে এসে ঢাল ও তরোয়াল নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডান পায়ে পদক্ষেপ দিয়ে বা টেনে টেনে দেহ ডাইনে, বাঁয়ে বাঁকিয়ে নৃত্যটি করতে থাকে। অনেকক্ষণ একইভাবে নৃত্য করার পর 'কামাল' নৃত্যটি শেষ করার পূর্বেই 'গাবুর' (সহকারী) ঢাল-তরোয়াল নিয়ে নৃত্য শুরু করে। আবার বেশ কিছুক্ষণ নৃত্য চলার পর 'গালিব' (অপর সহকারী) এই নৃত্যটি ধরে রাখে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে একের পর এক নৃত্যটি শেষ না করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই ভঙ্গীতে নাচতে থাকে। অর্থাৎ বহিরাগত কোন অশুভশক্তি পূজা ক্ষেত্রে বা পূজা চলাকালীন প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য অশুভশক্তির বিরুদ্ধে এই নৃত্যটি করা হয়। এই নৃত্যটিকে বলা হয় 'গ্রাতুলি'।

গারো উপজাতিদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির অস্থি দাহ করার পূর্বে মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করে নৃত্যের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানায়। এই নৃত্যটিকে 'মাংরিয়া' বলে। নারী ও পুরুষ সবাই মিলে এই নৃত্যে যোগ দেয়।

নারী ও পুরুষ দুই সারিতে দাঁড়িয়ে নৃত্য শুরু করে। বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে অত্যন্ত ধীর লয়ে এক হাত কোমরে রেখে অন্যহাত সোজাভাবে উপরে তুলে অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে ডান ও বাঁ হাত ক্রমান্বয়ে উপরে তুলে সামনে ঝুঁকে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে। এই সময় পদক্ষেপ হচ্ছে ডান পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে মাটিতে আঘাত করে এবং বাঁ পা সম অবস্থায় থাকে। পুনরায় বাঁ পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে মাটিতে আঘাত করে এবং ডান পা সম অবস্থায় থাকে। এইরূপ পদক্ষেপ দিয়ে পর্যায়ক্রমে নৃত্য চলতে থাকে। হাত উপরে তুলে মৃতকে বিদায় জানাচ্ছে এবং দুঃখে মুহ্যমান এইরূপ ভঙ্গী করে নৃত্যটি করে। একই ভঙ্গিমায় এবং বিলম্বিত লয়ে ভোর চারটে পর্যন্ত নৃত্যটি চলতে থাকে। আগুন দেওয়ার প্রাক্ মুহূর্তে নৃত্যের সমাপ্তি ঘটে।

এই ধরনের নৃত্য রিয়াং উপজাতিদের মধ্যেও দেখা যায়। গারো উপজাতিদের অস্থি পোড়ান উপলক্ষ্যে 'মাংরিয়া' নৃত্যটির সঙ্গে রিয়াং উপজাতিদের অস্থি বিসর্জন উপলক্ষ্যে নৃত্য 'কুথৈনাইম' এর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় নৃত্যই পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মের অন্তর্গত। অস্থি পোড়ান বা বিসর্জন উপলক্ষ্যে নৃত্য সারা রাত ধরে চলতে

থাকে। দুটো নৃত্যের উদ্দেশ্য একই। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে শেষ বিদায় জানান। তবে গারো উপজাতিরা অস্থি পুড়িয়ে ফেলে এবং রিয়াং উপজাতিরা জলে বিসর্জন দেয়। এটাই হচ্ছে দুই উপজাতিদের মধ্যে আচার-অনুষ্ঠানের পার্থক্য।

ত্রিপুরার রিয়াং এবং গারো উপজাতিদের শোক নৃত্যের সঙ্গে অরুণাচলের কিছু উপজাতিদের শোক নৃত্যের সঙ্গে নৃত্যের আঙ্গিকগত পার্থক্য থাকলেও মূলগত সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন অরুণাচলের সিংফো উপজাতিদের 'মঙলুপ' নাচ (শোক নৃত্য) ওয়াংচু উপজাতিদের 'ডনথাংপো নাচ' (অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ামূলক নাচ), নকটি উপজাতিদের 'পংতু নাচ (শোক নাচ), ইদুমিশমী উপজাতিদের 'আই-আহ' নাচ (শোক প্রকাশক এবং মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক) ইত্যাদি নৃত্যগুলির রিয়াং ও গারো উপজাতিদের শোকজ্ঞাপক নৃত্যের সঙ্গে যে সাদৃশ্য সেটা সমস্ত উপজাতিদের নৃত্যের মূল সূত্র যে একই সূত্রে গাঁথা তা এই নৃত্যগুলির মূলগত সাদৃশ্যের মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়।

খাসিয়া উপজাতিদের 'পাস-তি-এ' নৃত্য

ত্রিপুরায় বসবাসরত খাসিয়া উপজাতিরা সংখ্যায় খুবই অল্প। এদের মধ্যে বেশীরভাগই খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেছে। কেউ বৌদ্ধ ধর্মও গ্রহণ করেছে। বাকি কিছু সংখ্যক হিন্দু আছে। ত্রিপুরায় খাসিয়া উপজাতিদের জুম ক্ষেতে পান চাষ করা হচ্ছে অন্যতম উপজীবিকা।

পান চাষের পূর্বে খাসিয়া উপজাতিরা বর্ম্মা পূজা বা বিষ্ণু পূজা করে। এই বিষ্ণু পূজার আগে ওরা যথারীতি মোরগ বলি দেওয়ার অনুষ্ঠান করে। এরপর দুজন পুরুষ ঢাল এবং তরোয়াল নিয়ে দুজনে দুপাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের অঙ্গভঙ্গী করে একজন অপরজনকে অতিক্রম করে। অর্থাৎ পান চাষের মধ্যে কোন অশুভ শক্তির দৃষ্টি যেন না পড়ে। দ্বিতীয় ভঙ্গীতে দুই সারিতে ৮ জন করে পুরুষ দাঁড়ায়। দুই সারির সামনে ঢাল ও তরোয়াল নিয়ে দুজন থাকে। তরোয়ালকে খাসিয়া ভাষায় তরোয়ালই বলা হয়। ঢালকে বলে 'স্তেত্র'। আর পিছনে যারা দাঁড়ায় প্রত্যেকে দুহাত লম্বা একটা বাঁশ হাতে নেয়, যার মাথাগুলো চেরা থাকে। এই বাঁশটিকে বলে 'ছিন্দ্রিয়োং চিকেল'। 'চিকেল'-বাঁশ। বাঁশটিকে ধরে নাড়া দিলে শব্দ হয়। খাসিয়া উপজাতিরা এই বাঁশগুলো নাড়িয়ে শব্দ করে এক সারি থেকে অন্য সারিকে অতিক্রম করে। এই শব্দ করার কারণ হচ্ছে পানের বরোজে যাতে পাখীরা বা অন্য কোন জন্তু ভয় পেয়ে না আসে। এইভাবে কিছুক্ষণ করার পর সবাই মিলে সারিবদ্ধ হয়ে বৃত্ত রচনা করে নৃত্যস্থল ঘুরে আবার পূজা করে। এরপরই নৃত্যটির সমাপ্তি হয়।

ওঁরাও উপজাতিদের 'করমা' নাচ

ত্রিপুরায় বসবাসরত ওঁরাও উপজাতিরা ভাদ্র মাসের একাদশীতে করমা পূজা করে। বড় বট বৃক্ষের মত একটি গাছকে করম বা বলে অভিহিত করে। এই গাছের নীচে পূজা দেওয়া হয়। কৃষির উন্নতি ও ফসল কামনায় পূজাটি করা হয়। এই পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমন ধান ক্ষেতে সবেমাত্র ফসল উঠেছে। এই সময় পোকামাকড় যাতে ধ্বংস না করে সেজন্য পোকামাকড়ের দেবতা করম রাজার নামে দোহাই দিয়ে ভাদ্র মাসের একাদশীতে পূজাটি করা হয়। পূজার পর ছেলেমেয়েরা মিলে যে নৃত্যটি করে তাকে পূজার নামানুসারে করম বা করমা নৃত্য বলা হয়।

মূল নৃত্য

১ নং ভঙ্গী

৪টি অথবা ৬টি মেয়ে পরস্পর পরস্পরের কাঁধে ধরে সবাই এক সঙ্গে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পিছিয়ে যায়। অনুরূপভাবে ছেলেদেরও ৪ অথবা ৬ জনের একটি দল প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাঁধে হাত দিয়ে সামনে ঝুঁকে পিছিয়ে যায়। পুরো ভঙ্গীটিই বৃত্তাকারে করে। তবে ছেলেদের দল ও মেয়েদের দুটো দল একই সাথে সংযুক্ত না হয়ে খোলা-শৃঙ্খল (open chain) অনুসারে বৃত্তাকারে ঘোরে। ক্রমাগত সামনে পিছনে যাওয়া–এই ভঙ্গীটি এদের প্রত্যেকের দেহে একই সাথে দোলনের সৃষ্টি করে।

২ নং ভঙ্গী

অর্দ্ধবৃত্তাকারে ছেলে ও মেয়ের দল একই সাথে খোলা শৃঙ্খল (open chain) অবস্থায় একবার সামনে এগিয়ে যায়, পুনরায় পিছিয়ে আসে। এই সময় পদসঞ্চালন হচ্ছে ডান পা তুলে দুবার পদক্ষেপ নিয়ে পিছিয়ে গিয়ে ডান পা গোড়ালীতে রাখে। এইরূপ পদসঞ্চালনে অর্দ্ধবৃত্তাকারে কয়েকবার করে পূর্বের মতই অর্থাৎ খোলা শৃঙ্খল অবস্থায় একই পদসঞ্চালন করে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে।

৩ নং ভঙ্গী

বৃত্তের একপাশে মেয়েরা, অন্যপাশে ছেলেরা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে সামনে আসে, পুনরায় পিছিয়ে যায়। এই সময় পদক্ষেপ হচ্ছে তিনমাত্রার ছন্দে সামনে গিয়ে চার মাত্রায় ডান পা গোড়ালিতে রেখে, ঈষৎ ঝুঁকে পুনরায় তিনমাত্রা পিছিয়ে গিয়ে চার মাত্রার ছন্দে শরীর ঝুঁকিয়ে দেয়। এইভাবেই নৃত্যটি চলতে থাকে। সবশেষে ছেলেরা ও মেয়েরা পাশাপাশি হয়ে খোলা শৃঙ্খল অবস্থায় বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে একসময় নৃত্যটি সমাপ্ত করে।

পঞ্চম অধ্যায়

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজকে বাদ দিয়ে মানব মন বিকশিত হতে পারে না। 'আনন্দ' হচ্ছে মানব জাতির চরম এবং পরম লক্ষ্য। এই আনন্দই আমরা পাই বিভিন্ন উৎসবের মাধ্যমে।

'উৎসব' একটা নির্দিষ্ট সীমারেখায় আবদ্ধ থাকে না এবং উৎসবের আনন্দ কারো একার সম্পদ নয়—তা হচ্ছে অনেকের মিলনে নির্মল আনন্দ উপভোগের সম্পদ। এখানেই উৎসবের সম্পূর্ণতা।

উৎসবের ক্ষেত্রে জাতি-উপজাতির তারতম্য কিছুই নেই—যেটুকু তফাৎ তা শুধু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই। শহরাঞ্চল, গ্রামাঞ্চল, পাহাড় সর্বত্রই মানুষ আনন্দে মেতে উঠে উৎসবকে কেন্দ্র করে।

ত্রিপুরার উপজাতিরাও এর ব্যতিক্রম নয়। ত্রিপুরার প্রায় প্রতিটি উপজাতিই তাদের কোন পূজা, ফসল ঘরে তোলার পর নবান্ন উৎসব, কোন বিবাহকে কেন্দ্র করে উৎসব, আবার উপজাতি যুবক-যুবতীরা যেকোন সামাজিক অনুষ্ঠানে মিলে মিশে আনন্দ করা ইত্যাদি বিষয়গুলিই উপজাতি জীবনে উৎসবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। ত্রিপুরার উপজাতিদের বেশীরভাগ উৎসব হচ্ছে নৃত্যকেন্দ্রিক। নৃত্য এবং গীত হচ্ছে তাদের যেকোন উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

নিম্নে উপজাতি ভেদে উৎসবগুলোর নাম দেওয়া হল এবং উৎসব কেন্দ্রিক নৃত্যগুলোর পরিচয় এবং বিশ্লেষণ করা হল।

(১) ত্রিপুরী, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া এবং হালাম উপজাতিদের উপশাখা কলই এবং রূপিনী—এদের প্রধান উৎসব—'গড়িয়া' পূজা এবং উৎসব উপলক্ষ্যে গড়িয়া নৃত্য।

(২) রিয়াং [এবং উপশাখা উছই] উপজাতিদের উৎসব সংক্রান্ত নৃত্য—'হজাগিরি'।

(৩) চাকমা উপজাতিদের প্রধান উৎসব—'বিজু' এবং উৎসবের নৃত্য বিজু নৃত্য।

(৪) মগ উপজাতিদের যুবক-যুবতীরা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে 'বিয়াসা' এবং 'পঙ্খু আকা' এই দুটো উৎসবাঙ্গের নাচ হিসেবে করে।

(৫) গারো উপজাতিদের প্রধান উৎসব 'ওয়াংলা'। 'ওয়াংলা' উৎসবকে ঘিয়ে যে নৃত্যের আয়োজন করা হয় তাকে ওয়াংলা নৃত্য বলা হয়।

(৬) ত্রিপুরার সাঁওতাল উপজাতিদের বিবাহ সংক্রান্ত উৎসব উপলক্ষ্যে নাচ দাঁ-বাপ্‌লা।

(৭) ওঁরাও উপজাতিরা দোলপূর্ণিমায় 'ফাগুয়া' নাচ করে।

(৮) মুণ্ডা উপজাতিরা তাদের যেকোন অনুষ্ঠানে ঝুমুর নাচ করে।

(৯) মিজো উপজাতিরা যেকোন উৎসবে প্রধান যে নাচটি করে তা হচ্ছে–'চেরো'। এছাড়া উৎসবাঙ্গের নাচ হিসেবে খোয়াল্লাম এবং ছেইলাম নাচও এদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়।

(১০) কুকী উপজাতিদের সামাজিক কোন উৎসবে বা কোন অনুষ্ঠানের নাচ– 'তাঙ্গডাম'।

(১১) কুকী উপজাতিদের প্রশাখা দারলং উপজাতিদের উৎসবাঙ্গের নাচ 'জ্যাঠলুয়াং'।

ত্রিপুরী উপজাতিদের গড়িয়া নৃত্যের বর্ণনা এবং বিচার বিশ্লেষণ

গড়িয়া নৃত্যটিও অনেকগুলো পর্বে ভাগ করে করা হয়। কক্‌বরক ভাষীদের মধ্যে প্রচিলত আছে যে পূর্বে এই গড়িয়া নৃত্য ১০৮টি পর্বে উপস্থাপনা করা হত (অনেকটা নাট্যশাস্ত্রের ১০৮টি করণের মত)। কিন্তু এতগুলো ভঙ্গী কেউ আয়ত্ত রাখতে পারেনি। এক হচ্ছে নিত্যদিনের চর্চ্চার অভাব, আর এক হচ্ছে জীবন ধারনের তাগিদে নানারূপ জীবিকায় নিয়োজিত থাকার দরুন অনেকগুলো ভঙ্গীর বিলুপ্তি ঘটে। বর্তমানে কক্‌বরক ভাষীদের মধ্যে গড়িয়া নৃত্য উর্দ্ধে ২৪/২৫টি পর্বে উপস্থাপনা করে। নিম্নে ৭/৮টি পর্বে উপস্থাপনা করে।

একটি ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের গড়িয়া নৃত্য ও বিশ্লেষণ

১ নং ভঙ্গী–'লাজরুমানী' (নৃত্যে অংশগ্রহণ করার জন্য আনন্দ করে আসা)

অভিনয় দর্পণ ও নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

যুবক-যুবতীরা এক সারিবদ্ধ হয়ে হাত দুটো 'পল্লব' হস্ত করে বাঁদিক থেকে ডান দিকে, আবার ডান দিক থেকে বাঁদিকে সঞ্চালন করে এবং সেইসঙ্গে ডান পা সমভাবে রেখে বাঁ পা টেনে নিয়ে আসে এবং বাঁদিকেও একই পদক্ষেপ দিয়ে অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘুরে বৃত্তের বহির্মুখী হয়ে পুনরায় একই ভঙ্গী করে নৃত্যস্থলে আসে। (এই ভঙ্গীটিও পদচালনা অর্থাৎ এক পা সমভাবে রেখে অন্য পা মাটিতে টেনে নিয়ে আসা–এর সঙ্গে অভিনয় দর্পণে বর্ণিত 'লোলিত চারীর' কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। (লোলিতচারী–ভূমিতে পদতল স্পর্শ না করে কেবলমাত্র পদের অগ্রভাগ দ্বারা ভূমিকে

স্পর্শ করার নাম লোলিতচারী। এই ভঙ্গীটি করাকালীন মেয়েদের মধ্যে 'উদ্‌বাহিতা' কটির প্রয়োগ দেখা যায়। উদ্‌বাহিতা কটি–ধীরে ধীরে দুই পার্শ্ব একটির পর একটি উন্নত ও অবনত করালে তাকে উদ্‌বাহিতা কটি বলে)।

২ নং ভঙ্গী–'বরগরিংমানী' (লোকজনকে ডাকা)

এই পর্বটি তিনটি ভাগে উপস্থাপনা করে। প্রথমভাগে গড়িয়া পূজার আসার জন্য লোকজনদের ডাকে।

(ক) বৃত্তের কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে ডান পা হাঁটু বাঁকিয়ে সমভাবে রেখে এবং বাঁ পা প্রসারিত করে, বাঁ হাত পাশে নীচে প্রসারিত করে এবং ডান হাত উপরে রেখে আন্দোলন করে অর্থাৎ লোকজনদের ডাকছে–এইরূপ ভঙ্গী করে ডান দিকে তিনবার যায়। পুনরায় একই ভঙ্গী করে বাঁ দিকে যায়।

(খ) দ্বিতীয় বৃত্তের বহির্মুখী হয়ে ডান হাত কপিত্থ মুদ্রা করে ডান পাশে রাখে। আবার একই ভঙ্গী বাঁদিকে করে অর্থাৎ যাদের ডেকেছে তাদের দুপাশে বসতে বলার ভঙ্গী করে।

(গ) দেহকে একবার ডান পাশে ঘোরায়। আবার বাঁ পাশে ঘোরায় অর্থাৎ লোকজন যারা এসেছে তারা সবাই দুপাশে বসেছে কিনা তা দেখতেই এই ভঙ্গী করে।

নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

প্রথম ভাগে ভঙ্গীটি করাকালীন পায়ের অবস্থান যেভাবে করা হয়, তার সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত 'প্রত্যালীড়' স্থানের সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রত্যালীড় স্থান–দুই পায়ের ব্যবধান পাঁচ তাল। দক্ষিণ পদ কুঞ্চিত ও বামপদ প্রসারিত। উপরোক্ত ভঙ্গীটির ক্ষেত্রে নৃত্যশিল্পীরা পর্যায়ক্রমে ডান পা ও বাঁ পা কুঞ্চিত করে ভঙ্গীটি করে। ডান হাত অথবা বাঁ হাত উপরে তুলে যখন সঞ্চালন করে, তখন বাহুর যে অবস্থান হয়, এর সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত সরল বাহুর সাদৃশ্য দেখা যায়। সরলবাহু–উর্দ্ধে, পার্শ্বে বা নীচে বাহু প্রসারিত হলে তাকে সরলবাহু বলে। দ্বিতীয় ভাগে (খ) হাতে কপিত্থ মুদ্রা ব্যবহার করা হয়। কপিত্থ হস্ত–নাট্যশাস্ত্র অনুসারে হস্তের মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা বক্র অবস্থায় এবং তর্জনী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠা দ্বারা পীড়িত হয়ে বক্র হলে কপিত্থ হস্ত বলা হয়। কপিত্থ হস্ত করে যে ভাবে বাহু সঞ্চালন করে সামনে পাশে নিয়ে ভঙ্গীটি করা হয় এতে 'অপবিদ্ধ' বাহু এবং 'প্রসারিত' বাহুর প্রয়োগ দেখা যায়। অপবিদ্ধ বাহু–মণ্ডলাকারে বক্ষ থেকে নির্গত বাহুর নাম অপবিদ্ধ, অগ্রবর্তী স্থানে ধাবিত বাহুর নাম 'প্রসারিত')

৩ নং ভঙ্গী–'খুমতইখলমানি' (ফুল তোলা)

এই পর্বটিও দুই ভাগে নৃত্যে রূপায়িত করা হয়।

নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় দর্পণের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

(ক) হাঁটু ভেঙ্গে দেহকে পিছন দিকে বাঁকিয়ে ঘুরিয়ে এনে ডান পাশে ঈষৎ ঝুঁকে ডান হাত কপিত্থ হস্ত করে নীচু থেকে ফুল তুলে এনে কানে দেওয়ার ভঙ্গী করে। অনুরূপ বাঁদিকেও করে।

(খ) এক পা সম অবস্থায় রেখে অন্য পা মাটিতে টেনে হাত দুটো দুপাশে রেখে একবার ডান পাশে ও বাঁ পাশে পর্যয়ক্রমে অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘোরে। অর্থাৎ দুইপাশে ফুল গোঁজার ভঙ্গী করে। (এই ভঙ্গীটি যুবক-যুবতীরা যখন পিছনদিকে দেহকে বাঁকিয়ে দেয়, তখন 'নিভুগ্ন' বক্ষের প্রয়োগ দেখা যায়। নিভুগ্ন বক্ষ–বক্ষদেশকে কঠিনভাবে উন্নত করা, কাঁধ দুটিকে নত না করা। উপর দিকে তোলা অবস্থাকে নিভুগ্ন বক্ষ বলা হয়। দ্বিতীয় ভাগে পা মাটিতে টেনে ঘোরার মধ্যে অভিনয় দর্পণে বর্ণিত লোলিতচারীর প্রয়োগ দেখা যায়)।

৪ নং ভঙ্গী–'মতায়খুলুমানী' (দেবতাকে নমস্কার)

অভিনয় দর্পণের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

বৃত্তের কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে পর্যায়ক্রমে উভয় পা তুলে লাফিয়ে নমস্কার করে। আবার বহির্মুখী হয়ে একইভাবে নমস্কার করে। (এখানে পা তুলে লাফিয়ে চলার ভঙ্গীর মধ্যে অভিনয় দর্পণে বর্ণিত 'চংক্রমণচারীর' প্রয়োগ দেখা যায়। চংক্রমণচারী–কোন পার্শ্বদেশ উঁচু করে, সেইদিকে পা উঁচুতে তুলে ভূমিতে স্থাপন করে। এইরূপ ভঙ্গীটিকে চংক্রমণচারী বলে)।

৫ নং ভঙ্গী–'সূঁচীখবামানি' (মাটি থেকে সূঁচ তোলা)

এই অংশটিও দুইভাগে প্রকাশ করে।

(ক) যুবক-যুবতীরা নীচু হয়ে হাঁটু ধরে তিনবার জোড় পায়ে লাফিয়ে একবার ডান পাশে ঘোরে ও একবার বাঁ পাশে ঘোরে। অর্থাৎ মাটিতে সূঁচ খোঁজার ভঙ্গী করে।

খ) দুহাত পাশাপাশি 'পল্লব' হস্ত করে নীচু থেকে সঞ্চালন করে উঠিয়ে এনে মুষ্ঠি হস্ত করে। অর্থাৎ মাটি থেকে সূঁচ তোলার ভঙ্গী করে।

৬ নং ভঙ্গী–'আকতোলাইতুকমানী' (তোতাপাখীর বাচ্চাকে খাওয়ান)

বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান প্রতিটি যুবক ও যুবতী একে অপরের দিকে দেহকে বাঁকিয়ে, এক পা হাঁটু ভেঙ্গে সম অবস্থায় রেখে, অপর পা প্রসারিত করে পায়ের অগ্রভাগের উপর অবস্থান করে হাত দুটোকেও পিছন দিকে প্রসারিত করে করতল ঘুরিয়ে উত্তান (চিৎ) অবস্থায় রেখে, প্রসারিত পায়ের অগ্রভাগ দ্বারা তিনবার মাটিতে আঘাত করে এবং পরস্পর পরস্পরের নিকটে মস্তক তেরচাভাবে রেখে পাখী তার ছানাকে খাবার দিচ্ছে এই ভঙ্গী করে ও পাখীর ডানান ভঙ্গীতে দুটো হাত পিছন দিকে প্রসারিত করে। এই ভঙ্গীটিই পুনরায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিপরীত পার্শ্বে করে।

নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় দর্পণের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

এখানে দাঁড়াবার ভঙ্গীতে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত প্রত্যালীঢ় স্থানের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রত্যালীঢ় স্থান–দক্ষিণ পদ কুঞ্চিত এবং বামপদ প্রসারিত। এখানে উভয় পদদ্বয় পর্যায়ক্রমে কুঞ্চিত ও প্রসারিত করা হচ্ছে। পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে ভূমিতে তিনবার আঘাত করার ভঙ্গীর সঙ্গে অভিনয় দর্পণে উল্লেখিত 'কুট্টনচারী'-র প্রয়োগ দেখা যায়। কুট্টনচারী–গোড়ালী তুলে পায়ের অগ্রভাগ দ্বারা মাটিতে প্রহার করা হলে তাকে কুট্টনচারী বলে)।

৭ নং ভঙ্গী–'মাইনাগমানী' (ধান মাড়ান)

নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

যুবক-যুবতীরা নীচু হয়ে হাত দুটো পাশে রেখে ডান ও বাঁ পা পর্যায়ক্রমে সামনে পিছনে চালনা করে, সেইসঙ্গে দুটো হাত ও সামনে পিছনে চালনা করে বৃত্তের কেন্দ্রাভিমুখে যায়। পুনরায় একই ভঙ্গী করে পিছিয়ে আসে। (পদচালনার এই ভঙ্গীর সঙ্গে 'চাষগতি' ভৌমীচারীর কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়।)

৮ নং ভঙ্গী–'সিকালাবেংমানী' (যুবক-যুবতীরা নাচতে নাচতে চলে)

প্রত্যেকে ডান পা কুঞ্চিত করে (হাঁটু ভেঙ্গে) তিন মাত্রার ছন্দে পা ফেলে, পিছনে বাঁ পা টেনে নিয়ে বৃত্তের কেন্দ্রাভিমুখে যায় এবং সেই সঙ্গে ডান হাত পতাকা হস্ত করে নিম্নাভিমুখী রেখে নীচু থেকে সঞ্চালন করে এনে কাঁধের কাছে রাখে। পুনরায় বৃত্তের বহির্মুখী হয়ে বাঁ পা এবং বাঁ হাত দিয়ে একই ভঙ্গী করে কেন্দ্রাতিগে যায়।

এখানেও অনেকটা প্রত্যালীঢ় স্থানের মত দাঁড়িয়ে পিছনের পা টেনে ভঙ্গীটি করে এবং পিছনের পা অগ্রভাগের উপর রেখে মাটিতে স্পর্শ করে টেনে নিয়ে যাবার ভঙ্গীর সঙ্গে অভিনয় দর্পণে বর্ণিত 'লোলিতচারী'-র সাদৃশ্য দেখা যায়। (লোলিত-চারী—কেবলমাত্র পদের অগ্রভাগ দ্বারা ভূমিতে স্পর্শ করার নাম লোলিতচারী)।

৯ নং ভঙ্গী—'সিবলাকাছুমানী' যুবকদের দ্বারা যুবতীদের রাস্তা অবরোধ করা)

বৃত্তাকারে দাঁড়ান প্রত্যেকটি যুবতীর বিপরীত দিকে যুবকরা কোমরে হাত দিয়ে এক পা সামনে রেখে তিন মাত্রা দাঁড়িয়ে সামান্য লাফিয়ে ঘুরে এসে মেয়েদের মুখোমুখি দাঁড়ায়। পুনরায় তিনমাত্রা দাঁড়িয়ে ঘুরে নিজেদের জায়গায় চলে আসে। (এই ভঙ্গীটি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করা হয়।)

১০ নং ভঙ্গী—'চুবুইবারমানী' চেড়ুই পাখীর মত লাফ দেওয়া)

নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

বৃত্তাকারে সবাই অর্ধেক বসে দুটো বাহু কুঞ্চিত করে সামান্য বক্র রেখে হাত দুটো মুষ্টি মুদ্রায় বক্ষ্যের সামনে পাশাপাশি রেখে জায়গায় তিনবার লাফিয়ে বৃত্তের কেন্দ্রাভিমুখে যায়। পুনরায় একইভাবে লাফিয়ে নিজের জায়গায় চলে আসে। আবার বিপরীত দিকে ঘুরে বৃত্তের বহির্মুখে তিনবার একই ভঙ্গীতে লাফিয়ে যায় এবং পিছিয়ে আসে। (এখানে কুঞ্চিত বাহুর অবস্থানের সঙ্গে 'নম্র বাহুর' প্রয়োগ দেখা যায়। যখন তীক্ষ্ণ কনুই সহজেই বক্রীকৃত হয়, সেই বাহুকে কুঞ্চিত বলে এবং কুঞ্চিত বাহু সামান্য বক্র হলে নম্র বাহু হয়। এই ভঙ্গীটিতে জোড় পায় লাফ দেবার মধ্যে হরিণের গতি পরিলক্ষিত হয়)।

১১ নং ভঙ্গী—'মছক হাছালাক মানি' হরিণের জিভ দিয়ে মাটি চেটে দেওয়া)

নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

প্রত্যেকে বহির্মুখী হয়ে দুহাতে মাটিতে স্পর্শ করে তিনবার জোড় পায়ে লাফিয়ে বৃত্তের কেন্দ্রাভিমুখে যায়। পুনরায় একই ভঙ্গীতে বৃত্তের অন্তর্মুখী হয়ে লাফিয়ে নিজেদের স্থানে চলে আসে। ক্ষার মাটি হলেই হরিণ জিভ দিয়ে সেই মাটি চাটে।

ঐ বিষয়টিই ওরা এখানে নৃত্যের মধ্যে রূপায়িত করেছে। ঐ ভঙ্গীটিতে 'অধোমুখ' বাহুর প্রয়োগ দেখা যায়। ভূমিস্পর্শী বাহুর নাম অধোমুখ। নীচু হয়ে জোড় পায়ে লাফানোর মধ্যে হরিণের গতির ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়)।

১২ নং ভঙ্গী–'ফানচুইমলিমানী' (তুলা থেকে সূতা বের করে কাঠিতে জড়ান)

যুবক-যুবতীরা নীচু হয়ে বাঁ হাত মুষ্টি মুদ্রা ও ডান হাত পতাকা হস্ত নিম্নাভিমুখী করে সামনে পিছনে চালনা করে। সেই সঙ্গে ডান ও বাঁ পা পর্যায়ক্রমে সামনে পিছনে চালনা করে বৃত্তের কেন্দ্রাভিমুখে যায় এবং একই ভঙ্গীতে আবার নিজেদের জায়গায় চলে আসে। পুনরায় বৃত্তের বহির্মুখি হয়ে একইভাবে তিনবার হস্ত ও পদচালনা করে কেন্দ্রাতিগে যায় এবং একই ভঙ্গীতে স্বস্থানে চলে আসে।

(ভঙ্গীটিতে পতাকা ও মুষ্টি হস্তের প্রয়োগ দেখা যায় এবং পদচালনার মধ্যে চাষগতি ভৌমিচারীর প্রয়োগ দেখা যায়। এই ভঙ্গীটি করার সময় স্কন্ধের যে সঞ্চালন হয়, তার সঙ্গে লোলিত স্কন্ধের প্রয়োগ দেখা যায়। ললিত স্কন্ধ–হস্ত এবং পদ সামনে পিছনে চালনার সঙ্গে স্কন্ধের ও ডান ও বাঁ পাশে চালনা হয়। একেই লোলিত স্কন্ধ বলা হয়)।

১৩ নং ভঙ্গী–'তকবুতালাইমানি' (জঙ্গলের তকবু নামের পাখীদের ঝগড়া

বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে হাঁটুতে হাত রেখে জোড় পায়ে মৃদু লাফিয়ে এক পা তুলে কাঁধে হাত রাখে এবং পুনরায় জোড়পায়ে মৃদু লাফিয়ে একে অপরের হাতে আঘাত করে। অর্থাৎ পাখীরা মুখোমুখি হয়ে ঝগড়া করছে–সেটাই এই ভঙ্গীটিতে প্রকাশ করে। (এই ভঙ্গীটির মধ্যে আধুনিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়)।

১৪ নং ভঙ্গী–'মাইসুমানী'-(গাইল ও চিয়া দিয়ে ধান ভানা। ককবরক ভাষায় গাইল-বসাম, চিয়া-বম)

এই ভঙ্গীটি দুটো ভাগে উপস্থাপনা করে। (ক) দুহাত তুলে 'চিয়া' ধরার ভঙ্গী করে জোড় পায়ে মৃদু লাফ দিয়ে হাত নামিয়ে ধান ভানার ভঙ্গী করে। (খ) হাত দুপাশে রেখে দুটো পা পর্যায়ক্রমে সামনে প্রসারিত করে পিছনে নিয়ে দুবার দুপাশে ঘুরে পুনরায় ধান ভানার ভঙ্গীটি করে। অর্থাৎ মাটিতে পড়ে থাকা ধানগুলো পা দিয়ে টেনে এনে পুনরায় ধান ভানে। (এই ভঙ্গীতে হাত দুটো দুপাশ থেকে উপরে

উঠিয়ে নিয়ে 'চিয়া' ধরার ভঙ্গীটি খুব সুন্দর ভাবে করে। দুটো হাত উপরে তোলার সময় নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত উদ্বৃত্ত বাহুর প্রয়োগ হয়।)

১৫ নং ভঙ্গী-(ছোট বাচ্চার জামা কাপড় ধোওয়া)

প্রত্যেকে নীচু হয়ে দুহাত আন্দোলন করে উভয় পার্শ্বে নিয়ে গিয়ে (অর্থাৎ কাপড়গুলো জলে ধুয়ে) একবার ডান পাশে এক হাত উত্তান অবস্থায় রেখে অন্য হাত দিয়ে আঘাত করে, আবার বা পাশেও একই ভঙ্গী করে পুনরায় হাত দুটো আন্দোলন করে ঘুরে আসে। অর্থাৎ দুপাশে কাপড়গুলো কেচে নিয়ে পুনরায় জলে ধোওয়ার ভঙ্গী করে।

১৬ নং ভঙ্গী–'শিকাম্বুকখচামানী' (শামুক তোলা)

ডান হাঁটু কুঞ্চিত করে পা সম অবস্থায় রেখে বাঁ পা প্রসারিত করে পায়ের অগ্রভাগের উপর রেখে, মাটিতে টেনে ডান পাশে গিয়ে দেহ বাঁকিয়ে নীচু হয়ে ডান হাত সমদংশন মুদ্রা করে দুবার শামুক খোঁজার ভঙ্গী করে তিনমাত্রায় শামুক উঠিয়ে পিঠে বাঁধা খাড়াতে রাখাত ভঙ্গী করে। পুনরায় একই ভঙ্গী বাঁ পাশে করে।

অভিনয় দর্পণের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

(এখানে পায়ের অগ্রভাগ দ্বারা ভূমিতে স্পর্শ করে টেনে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে অভিনয় দর্পণে বর্ণিত 'লোলিত' চারীর সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সমদংশন মুদ্রা– অভিনয় দর্পণ অনুসারে হস্তের অঙ্গুলীগুলিকে ফাঁক ফাঁক ও কিঞ্চিত বক্র করে কর-তলাভিমুখী করে বারবার যদি সংযুক্ত ও বিমুক্ত করা হয় তাকে সমদংশন বলে।)

১৭ নং ভঙ্গী–'মখরাহরসীমানী' (বাঁদরের আগুন ধরানো)

প্রত্যেকে নীচু হয়ে দুটি হাত মুষ্টি করে সামনে পিছনে চালনা করে এবং ডান ও বাঁ পা পর্যায়ক্রমে চালনা করে বৃত্তের কেন্দ্রাভিমুখে যায় এবং ঘুরে পুনরায় একই ভঙ্গীতে বৃত্তের বহির্মুখে যায়। (পদদ্বয়ের চালনার সঙ্গে চাষগতি ভৌমিচারীর সাদৃশ্য দেখা যায়।)

১৮ নং ভঙ্গী–'খরমাস্ত্রুথরাইমানি' (ঘরের ঝুল পরিষ্কার করা)

ডান সূচীমুখ মুদ্রা করে ডান পাশ থেকে ঘুরিয়ে বাঁ পাশে নিয়ে যায়, সেই সঙ্গে ডান পায়ের অগ্রভাগ দ্বারা মাটিতে স্পর্শ করে বাঁদিকে টেনে নিয়ে যায়। অবার বাঁ পা ও বাঁ হাত একই ভঙ্গী করে ডান দিকে নিয়ে যায়।

অভিনয় দর্পণ ও নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

(পায়ের এই ভঙ্গীটির সঙ্গে অভিনয় দর্পণে বর্ণিত লোতিচারীর সাদৃশ্য দেখা যায় এবং যেভাবে বাহু উপরে প্রসারিত করে একপাশ থেকে অন্যপাশে নিয়ে যায় তাতে সরল বাহুর প্রয়োগ দেখা যায়।)

১৯ নং ভঙ্গী–'তবুইখিতুংমানি' (মোরগের লেজ নাড়ান)

বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে সামনে ঈষৎ ঝুঁকে ইংরাজী অক্ষর 'Z' (জেড্) এর আকারে তিনবার জোড়পায়ে লাফিয়ে হাতে তালি দিয়ে পিছিয়ে আসে। পুনরায় বাঁদিকে ঘুরে একই ভঙ্গী করে।

নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

(এই ভঙ্গীর মধ্যে এদের জোড় পায়ে লাফকে সিংহগতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই 'জেড্' এর আকারে লাফানোর সময় কোমরের যে সঞ্চালন হয় তার সঙ্গে 'উদ্‌বাহিতা' কটি দেশের প্রয়োগ দেখা যায়। উদ্‌বাহিতা কটি–ধীরে ধীরে দুটি পার্শ্বে একটির পর একটিকে উন্নত ও অবনত করালে তাকে 'উদ্‌বাহিতা' কটি বলে।

২০ নং ভঙ্গী–'নাওয়াইবীরমানি' (পাখীর উড়ে যাওয়া)

পদদ্বয় পর্যায়ক্রমে সামনে পিছনে চালনা করে দুহাত দুদিকে পাখীর ডানার মত প্রসারিত করে দেহকে উভয় পার্শ্বেই অল্প অল্প বাঁকিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে এক সারি হয়ে নৃত্যস্থল থেকে প্রস্থান করে।

নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

(এই ভঙ্গীটিতে যেভাবে পাখীর ডানার মত দুটো হাত দুপাশে আন্দোলিত করা হয়, এর সাথে নৃত্য হস্ত দণ্ডপক্ষ ও পার্শ্বমণ্ডলী নৃত্যহস্তের কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়। দণ্ডপক্ষ–হংসপক্ষ হস্তদ্বয় ঘূর্ণিত অবস্থায় স্থান পরিবর্তন করলে এবং বাহুদ্বয় প্রসারিত হলে দণ্ডপক্ষ বলা হয়। দণ্ডপক্ষের কিছু সাদৃশ্য আসে এই কারণে যে কিছুটা হংসপক্ষ মুদ্রার আকৃতি করে বাহুদ্বয় প্রসারিত করে সঞ্চালন করা হয়। পতাকা হস্ত করে পার্শ্বমণ্ডলী করা হয়। কিন্তু এখানে 'পতাকা' হস্ত করা হয়নি। হাতকে হংসপক্ষ অবস্থায় শিথিল করে উর্দ্ধদেশ থেকে পার্শ্বদেশ থেকে পার্শ্বদেশে ভ্রমণ করান হয়।)

অন্যান্য ককবরক ভাষীদের গড়িয়া নৃত্য ত্রিপুরী উপজাতিদের গড়িয়া নৃত্যের সঙ্গে খুবই সাদৃশ্যমান। গড়িয়া নৃত্যের পর্বগুলো সর্বত্র প্রায় একই। ত্রিপুরী উপজাতিরা সংখ্যা বেশী হওয়ার দরুন তাদের নাচের প্রভাব অন্যান্য কক্-বরক ভাষী গোষ্ঠীদের

উপর পড়েছে বলে ধারণা করা যায় । তবে সব উপজাতি সম্প্রদায়েরই নৃত্যের পরিবেশন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্বীকয়তা বিদ্যমান । যদিও গড়িয়া নৃত্যের পর্বগুলো সর্বত্র এক । অর্থাৎ জীবন ও জীবিকাভিত্তিক । কিন্তু প্রত্যেক উপজাতি সম্প্রদায়েরই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নৃত্যের আঙ্গিক ভিন্ন ।

যেমন ত্রিপুরী উপজাতিদের গড়িয়া নৃত্যে যে পরিশীলিত শব্দটির সঙ্গে আমরা পরিচিত হই, জমাতিয়াদের গড়িয়া নৃত্য কিন্তু সেই ধরনের নয় । বরং বলা যায় অনেক বেশী সহজ, সরল ও অনাড়ম্বরপূর্ণ । পক্ষান্তরে ত্রিপুরী উপজাতিদের গড়িয়া নৃত্যে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার উপযোগী চিন্তাচেতনার পরিচয় পাওয়া যায় । অথচ জমাতিয়াদের নাচে সুন্দর একটি গ্রামকেন্দ্রিক পরিশীলিত রূপ দেখতে পাওয়া যায় ।

অনুরূপভাবে নোয়াতিয়া উপাজাতিরাও গড়িয়া নৃত্যটি স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপনা করে । ডান হাতে রিয়া বা রিসা (উপজাতি মেয়েদের চিরাচরিত ঐতিহ্য এই রিয়া– বক্ষে বাঁধার এক টুকরো কাপড়) নিয়ে খামবাদ্যের তালে তালে দেহের দুপাশে হাত ঘোরাতে ঘোরাতে, সেই সঙ্গে দেহকেও আন্দোলিত করে নৃত্যটি করে ।

হালাম উপজাতিদের উপশাখা রূপিনী সম্প্রদায়ের গড়িয়া নৃত্যটি উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অভিনবত্বের সৃষ্টি করে । ত্রিপুরী উপজাতিদের মতই এরাও কয়েকটি পর্বে ভাগ করে গড়িয়া নৃত্যটি উপস্থাপনা করে । গড়িয়া নৃত্যে ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই অংশগ্রহণ করে । কিন্তু রূপিনী সম্প্রদায়ের গড়িয়া নৃত্য শুধুমাত্র মেয়েরাই উপস্থাপনা করে । একজন শুধু অচাই এর ভূমিকায় থেকে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী করে সমগ্র নৃত্যটি পরিচালনা করে । এদের নৃত্যের বিশেষত্ব হচ্ছে নৃত্য'নকসা বা কোরিওগ্রাফী । সব উপজাতি সম্প্রদায়ই গড়িয়া নৃত্য বৃত্তাকারে উপস্থাপনা করে । রূপিনী উপজাতিরা বৃত্তের মধ্যে সুন্দর নকসা তৈরী করে নৃত্যটি উপস্থাপনা করে । এখানে রূপিনী সম্প্রদায়ের গড়িয়া নৃত্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল ।

রূপিনী সম্প্রদায়ের গড়িয়া নৃত্য

নৃত্যের শুরুতে অচাই হাত জোড় করে সামনে বসে এবং পিছনে দুই সারিতে মেয়েরা হাত জোড় করে বসে গড়িয়ার বন্দনা গান শুরু করে । (এই ভঙ্গীটিতে যাত্রার প্রভাব দেখা যায়) গান শেষ হলে পর উঠে দাঁড়িয়ে শুরু হয় গড়িয়া নাচ ।

১ নং ভঙ্গী

বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে একজনের ডান হাত দিয়ে অপর জনের বাঁ হাত উপরে ধরে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত ধরে নীচে রেখে পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে মাটিতে তিনবার

আঘাত করে ঘুরে বা পাশের জনের সঙ্গে একইভাবে হাত ধরে মাটিতে পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে আঘাত করা।

২ নং ভঙ্গী

পূর্বোক্ত ভঙ্গীর পর তেহাই এর মত এক হাত কপিত্থ করে দুবার দুপাশে এক পায়ে ঘুরে এসে বৃত্তের অন্তর্মুখী হয়ে পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে মাটিরে তিনবার আঘাত করার সাথে সাথে হাতে তিনবার তালি দিয়ে পুনরায় বহির্মুখী হয়ে তিনবার তালি দেয়।

৩ নং ভঙ্গী

প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাত ধরে এক হাঁটু মুড়ে বসে দুই হাত উপরে তুলে অনেকটা সর্পশীর্ষ মুদ্রায় রেখে দুপাশে ধীরে ধীরে সঞ্চালন করে এবং বৃত্তের মধ্যে একটি মেয়ে দুহাত কপিত্থ মুদ্রা করে দুপাশে উপরে তুলে সঞ্চালন করতে থাকে।

৪ নং ভঙ্গী

বৃত্তের মধ্যে দাঁড়ান মেয়েটি এক হাত উপরে তুলে এক পা দিয়ে ঘুরে আসে। সেই সময় যারা বসে উপরে হাত সঞ্চালন করছিল তারা পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে বসা অবস্থায়ই একবার ডান পাশে শরীর বাঁকায়, আবার বাঁ পাশে শরীর বাঁকায়।

৫ নং ভঙ্গী

মাঝে দাঁড়ান মেয়েটি এবার ধীরে ধীরে উপরে দুহাত সঞ্চালন করে বসে পড়ে এবং বৃত্তকারে যারা বসা ছিল, এবার তারা ধীরে ধীরে দুই হাত উপরে তুলে দুপাশে সঞ্চালন করে উঠে দাঁড়ায়। এই ভঙ্গীটি বেশ ককেয়বার করা হয়। অর্থাৎ বৃত্তের চারদিকে দাঁড়ান মেয়েরা একবার বসে পড়ে এবং বৃত্তের মাঝের মেয়েটি তখন দাঁড়িয়ে হাত সঞ্চালন করে। পুনরায় সেই মেয়েটি বসে। বৃত্তের চারপাশের মেয়েরা দাঁড়িয়ে হাত সঞ্চালন করে।

৬ নং ভঙ্গী

নীচু হয়ে হাতে তালি দিয়ে একে অপরকে অতিক্রম করে গিয়ে তারপরের মেয়েটির একহাত ধরে অপর হাতে নিজের হাত দিয়ে তালি দেয়। এইভাবেই একে অন্যকে অতিক্রম করে বৃত্তাকারে ঘুরে নাচতে থাকে। পুনরায় একহাত তুলে তেহাই এর সাথে দুবার ঘুরে আসে।

এরপর নীচু হয়ে হাতে তালি এবং সামনে ও মাথার উপর তালি দিয়ে খুব দ্রুতলয়ে ঘুরে নৃত্যস্থল থেকে চলে যায়।

অচাই নৃত্যের শুরু থেকে পুরো নাচটিতেই অংশগ্রহণ করে। যখন মেয়েরা নৃত্যের শেষে চলে যায়, তখন অচাই এককভাবে একহাতে দা এবং অপর হাতে গড়িয়া দেবতার প্রতীক কলাগাছের টুকরোর মধ্যে ছোট বাঁশ পুঁতে তা নিয়ে নৃত্য করতে থাকে। নৃত্য করার সময় হাঁটু ভেঙ্গে পদসঞ্চালন করে এবং হাত দুটো সামনে, পাশে, উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সঞ্চালন করে। কখনও গড়িয়া দেবতার প্রতীক বাঁশ গাছটিকে প্রদক্ষিণ করে। এইভাবে কিছুক্ষণ নৃত্য করার পর অচাই এর নৃত্যের সমাপ্তি ঘটে।

এই রূপিনী সম্প্রদায়ের গড়িয়া নৃত্যের প্রতিটি ভঙ্গীর শেষে দুবার করে দুপাশে ঘুরে এসে পুনরয় অন্য ভঙ্গীটি শুরু করা–এতে কথক নৃত্যের 'তেহাই' অংশটির সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। (তেহাই–কোন একটি নির্দিষ্ট বোলের সমষ্টিকে সমানভাবে পর পর তিনবার বলার নাম 'তেহাই বা তিহাই'।) এদের নৃত্যের মধ্যে দুবার ঘোরার মধ্যে অভিনয় দর্পণে বর্ণিত 'একপাদ ভ্রমরী' এবং পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে মাটিতে আঘাত করার ভঙ্গীর মধ্যে 'কুট্টনচারীর' কিছু প্রয়োগ দেখা যায়। (একপাদ ভ্রমরী–এক চরণ দ্বারা অপর চরণকে দ্রুত ঘুরিয়ে নিয়ে এলে যেরূপ অবস্থা হয় তাকে একপাদ ভ্রমরী বলে) নৃত্যশিল্পীরা দুহাত উপরে উঠিয়ে সঞ্চালন করে যখন অবস্থান করে, তখন হাতের যে আকৃতি দেখা যায় তার সঙ্গে 'সর্পশীর্ষ' মুদ্রার কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়। (সর্পশীর্ষ হস্ত–বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সহ অঙ্গুলীসমূহ সংযত এবং করতল নিম্নমুখ থাকে) রূপিনী সম্প্রদায়ের গড়িয়া নাচের এই ভঙ্গীটি খুবই আকর্ষণীয় হয়। বৃত্তাকারে সবাই বসে এবং একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে হাত সঞ্চালন করে। পুনরায় মেয়েটি বসে পড়ে, বৃত্তাকারে দাঁড়ান মেয়েরা ধীরে ধীরে হস্ত সঞ্চালন করে দাঁড়িয়ে পড়ে। এই নৃত্য নক্সাটি বর্তমানে বাঙ্গালীদের দ্বারা চর্চ্চিত অনেক দলগত রবীন্দ্রনৃত্যেও দেখা যায়। কিন্তু এদের শহরে এসে রবীন্দ্রনৃত্য ইত্যাদি দেখার সুযোগ কম। ওরা নিজেরাই গড়িয়া নৃত্যটি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে এই ভঙ্গীগুলোর রূপ দিয়েছে। এই ভঙ্গীটি ব্যতীত অন্য কিছু ভঙ্গী, যেমন মুখোমুখি হয়ে এক অন্যের বিপরীতে দুহাত ধরে একপায়ে আঘাত করা, মুখোমুখি হয়ে একহাত কোমরে ধরে অন্য হাত উপরে তুলে একইভাবে এক পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করা, বিপরীত হাত ধরে অন্য হাত দিয়ে অপরের হাতে তালি দেওয়া ইত্যাদি ভঙ্গীগুলো একেবারেই অন্যান্য সম্প্রদায়ের গড়িয়া নাচ থেকে স্বতন্ত্র। এরা নৃত্যের সময় কটি সঞ্চালন করে না। কিন্তু যখন কোন ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়ায়, তখন একপাশে কটিদেশ বাঁকিয়ে রাখে।

কটির এই ভঙ্গীর মধ্যে নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত 'ছিন্না' কটির প্রয়োগ দেখা যায়। (ছিন্না–ঘুরে দাঁড়াতে গেলে কটি এক পাশে রাখলে তাকে 'ছিন্না' কটি বলা হয়) রূপিনী সম্প্রদায়ের নৃত্যশিল্পীরা প্রত্যেকটি ভঙ্গীই খুব পরিষ্কারভাবে এবং নিপুণতার সঙ্গে উপস্থাপনা করে।

ত্রিপুরী উপজাতিরাও গড়িয়া নৃত্য খুবই দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করে। এই সম্প্রদায়ের সমগ্র গড়িয়া নাচটিতে তাণ্ডবাঙ্গের ভঙ্গীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। রূপিনী সম্প্রদায়ের এই গড়িয়া নৃত্যের যে আকারটি (Form) দেখা যায় তাতে নৃত্যটিতে তাণ্ডব ভঙ্গীর প্রাধান্য দেখা গেলেও সমগ্র নাচের মধ্যে একটি কাব্যিক গতি দেখা যায়।

রিয়াং সম্প্রদায়ের কলসীর উপর দাঁড়িয়ে

ভারসাম্যের নৃত্য বা 'মাইখুলুংমৌসামু' বা 'হজাগিরিনৃত্য'

রিয়াং সম্প্রদায়ের এই ভারসাম্যের নৃত্যটির স্থানীয় নাম 'হজাগিরি'। এই নৃত্যটি কোন বিবাহ-অনুষ্ঠান উপলক্ষেক্ষ বা কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে অথবা ঘরে ধান আসার পর পূজা উপলক্ষ্যে করা হয়। কলসীর উপর উঠে, মাথায় বোতল নিয়ে নৃত্যটি করে। অর্থাৎ শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে নানারূপ কৌশল নৃত্যের মাধ্যমে প্রদর্শন করে।

১ নং ভঙ্গী

নৃত্যস্থলে ছেলেরা জলভরা তিনটি অথবা চারটি কলসী রেখে চলে যায়। মেয়েরা মাথায় বোতল এবং বোতলের উপর একটি লম্ফ (কুপী) জ্বেলে দুহাতে দুটো থালা নিয়ে, থালা শুদ্ধ হাত দুটো একবার উত্থান (চিৎ) করে পর মুহূর্তেই সোজা করে– এইভাবেই ওরা নৃত্যস্থলে প্রবেশ করে। কটিদেশে একইভাবে 'রেচিতা' ভঙ্গীতে সঞ্চালন করে এবং পা থেকে কোমর পর্যন্ত সর্পগতির ন্যায় আবর্তিত হতে থাকে।

২ নং ভঙ্গী

রিয়াং নৃত্যশিল্পীরা নৃত্যস্থলে এসে কিছুক্ষণ থালা ঘুরিয়ে, এরপর কলসীর উপর দাঁড়িয়ে থালা ঘোরাতে থাকে এবং কলসীর উপর দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ঘোরার পর কলসী থেকে নেমে থালা ঘুরিয়ে নৃত্যস্থল থেকে প্রস্থান করে।

৩ নং ভঙ্গী

ডালা নিয়ে একটি মেয়ে বাঁ হাতের তর্জনির উপর ডালা রেখে ডান হাত দিয়ে ডালাটি ঘুরিয়ে দিয়ে, এই ঘুরন্ত ডালা তর্জনীর উপর রেখে নৃত্যস্থলে প্রবেশ করে এবং কলসীর উপর দাঁড়িয়ে ঘুরন্ত ডালা বাঁ হাতের তর্জনীর উপর রেখে ধীরে ধীরে কলসীর উপর ঘুরতে থাকে। এই সময়ে দুপাশে দুটো মেয়ে দেহকে পিছন দিকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে সেখান থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসে। ডালা নিয়ে কলসী থেকে মেয়েটি নেমে আসে।

৪ নং ভঙ্গী

একজন ছেলে নৃত্যস্থলে একটি থালা রেখে কলসীটি নিয়ে চলে যায়। সেই থালার উপর দাঁড়িয়ে মেয়েটি পা দিয়ে থালাটিকে চালনা করে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। মেয়েটির মাথায় তখন বোতল এবং বোতলের উপর একটি লম্ফ (কুপী) বসান থাকে এবং হাতে দুটো থালা নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে থালার উপর দাঁড়িয়ে পা দিয়ে থালা চালনা করে নৃত্যস্থলে ঘুরতে থাকে (এখানে বলা আবশ্যক যে থালার উপর দাঁড়িয়ে নাচ শাস্ত্রীর নৃত্য কুচিপুড়ীতে দেখা যায়। কুচিপুড়ী নৃত্যশিল্পী অবশ্য থালার উপর দাঁড়িয়ে থালা চালনা করে ঘুঙ্গুরের মাধ্যমে পায়ের বিভিন্ন কাজ দেখায়। সেই সঙ্গে হাতেরও নানারকম সঞ্চালন করে থাকে। নৃত্যটি যেহেতু শাস্ত্রীয় তাই এতে নান্দনিক চেতনা ও মননশীলতার সংযোজন ঘটেছে। কিন্তু উপজাতিয় নৃত্যে সেটা আশা করা যায় না। তথাপি বোতল মাথায় নিয়ে দুহাতে দুটো থা ঘুরিয়ে, থালার উপর দাঁড়িয়ে চালনা করা নৃত্যটিতে কুশলতা এবং চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে)।

৫ নং ভঙ্গী

নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

নৃত্যস্থলে একটি ছেলে ফুল বা একটি টাকা রেখে চলে যায়। মেয়েটির যথারীতি হাত ঘুরিয়ে নাচতে থাকে। ধীরে ধীরে হাঁটু ভেঙ্গে দেহকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে সেই সঙ্গে হাত দুটো 'সর্পশীর্ষ' মুদ্রায় রেখে সঞ্চালন করে (অনেকটা মণিপুরী 'চালি'-র মত হাত সঞ্চালন), এরপর দুটো হাত ও মাথা একসঙ্গে পিছনে মাটিতে স্পর্শ করে মুখ দিয়ে টাকা বা ফুল তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে এসে পুনরায় হাত ঘোরাতে ঘোরাতে নৃত্যস্থল পরিত্যাগ করে। (এই ভঙ্গীটিতে নাট্যশাস্ত্রের 'অতিক্রান্ত' করণের সাদৃশ্য দেখা যায়।) এই নৃত্যটির সামগ্রিক কুশলতা খুব উন্নতমানের বলে প্রতীয়মান হয়।

চাকমা উপজাতিদের বিজু নৃত্য

ত্রিপুরায় বসবাসরত চাকমা উপজাতিদের সামজিক উৎসব ও পূজা উপলক্ষে নৃত্য প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উৎসব ও নৃত্য হল 'বিজু'। এটা অনুমান করা যায় যে, 'বিজু' শব্দটি বাঙ্গালীদের 'বিষু' থেকেই এসেছে। ত্রিপুরী উপজাতিরা একে 'বইসু' বলে। অহমীয়ারা একে 'বিহু' বলে।

চৈত্র মাসের শেষের দিন থেকেই এই উৎসব শুরু হয় এবং ৭ দিন ধরে চলে। বিজু তিন প্রকার। (১) ফুলবিজু–বছরের শেষের আগের দিন (২) মূল বিজু–চৈত্র সংক্রান্তির দিন (৩) গইচ্চা–পইচ্চা অর্থাৎ নূতন বছরের প্রথম দিন–শুয়ে গড়াগড়ি দিয়ে বিশ্রাম করার দিন।

নৃত্য বর্ণনা ও বিশ্লেষণ

এই বিজু নৃত্যটি চাকমা যুবক-যুবতীরা মিলে করে।

১ নং ভঙ্গী

নৃত্যারম্ভে যুবক-যুবতীরা দৌড়ে নৃত্যস্থলে এসে গানের কথার সঙ্গে মিলিয়ে মুখে হাত দিয়ে সবাইকে ডাকার ভঙ্গী করে বিজু উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য। বাঁ পায়ের অগ্রভাগ মাটিতে রেখে ডান পা দিয়ে তাল দিয়ে সম্পূর্ণ নৃত্যটি করা হয়।

২ নং ভঙ্গী

দুই হাত দুপাশে সঞ্চালন করে প্রত্যেকে নিজের জায়গায় ঘোরে অর্থাৎ গানের কথানুযায়ী 'ছেলেমেয়েরা মিলে সবাই উড়ে উড়ে যায়' বোঝাতে এই ভঙ্গীটি করে।

৩ নং ভঙ্গী

গানের কথা–'ভাই বোনেরা সবাই মিলে ফুল দিয়ে সাজ করি'।–এই সময় ওরা ডান হাতে অভিনয় দর্পণে বর্ণিত হংসাস্য মুদ্রা করে ফুল আনার ভঙ্গী করে সামনে থেকেনিয়েআসে।

৪নং ভঙ্গী - হো আমার বিজু দিন

ইত্যাদি গানের কথানুযায়ী দু'সারিতে সবাই বসে মুখের সামনে হাত রেখে শরীর দুপাশে আন্দোলন করে। উপরোক্ত গানের লাইনটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'হেই' করে বসা অবস্থা থেকে লাফিয়ে উঠে খুব দ্রুত লয়ে ডান কাঁধ একবার নাড়িয়ে উভয়

পাশে ঘুরে একটি বৃত্ত রচনা করে (ভঙ্গীটি অনেকটা অহমীয়াদের 'বিহু' উৎসবের ভঙ্গীর মত)।

৫নং ভঙ্গী

গানের কথাটি "ঘিলা খারা"। এই নামে একটি খেলা এই দিনে ওরা গাছের নীচে খেলে। চাকমা ভাষায় "খারা" বলে। দুই সারিতে যুবক -যুবতী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাথার উপর দুটো হাত আড়াআড়ি ভাবে রেখে অভিনয় দর্পনে বর্ণিত অনেকটা স্বস্তিক মুদ্রার মত করে গাছ বোঝায় (কত্থক নৃত্যে 'মুকুট' বোঝতে মাথার উপর হাতের যে ভঙ্গী করে বোঝান হয়, ঠিক সেইরকম হাত করে গাছ বোঝায়)। এরপর গাছের নীচে 'ঘিলখারা' ক্রীড়ার ভঙ্গী বোঝাতে গিয়ে ডান হাতে হংসাস্য মুদ্রা করে নীচে সঞ্চালন করে একটি দল অপর দলকে অতিক্রম করে।

৬নং ভঙ্গী

নাট্যশাস্ত্রের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

বিজু উৎসবের দিন ওরা শূকর কাটে। এই কথাটি নৃত্যের মধ্যে রূপায়িত করার সময় দুই হাতে নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত 'উর্ণনাভ মুদ্রার মত হাত করে শূকর দেখিয়ে ডান হাত ও বাঁ হাত দিয়ে পর্যায়ক্রমে কাটার ভঙ্গী করে।

৭নং ভঙ্গী

অভিনয় দর্পণের ভঙ্গীর সাদৃশ্য

গানের কথা 'বিজুর দিন ওরা বিন্নী চালের পিঠে (আকারে খুব বড় হয়) খাবে। এই সময় ওরা অভিনয় দর্পনে উল্লেখিত দুই হাত অর্দ্ধচন্দ্র হস্তের মত করে একটি হাত সামনে রেখে অপর হাতটি টেনে সামনে নিয়ে বড় আকৃতির পিঠের ভঙ্গী করে।

৮নং ভঙ্গী

বিজু উৎসবের দিন মদ্যপান করার ভঙ্গীটিতে যুবক -যুবতীরা দুটি হাত দিয়ে অভিনয় দর্পনে বর্ণিত শিখর মুদ্রা করে। মুখের কাছে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিয়ে মদ ঢেলে দেওয়ার ভঙ্গী করে বৃত্তাকারে ঘোরে। এই ভাবেই একসময় নৃত্যটি শেষ হয়।

এই বিজু নৃত্যে গানের কথার অর্থ এরা খুব পরিষ্কার ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছে মুখের অভিব্যক্তি দিয়ে এবং হাতের মধ্যে মুদ্রা আনার চেষ্টা চলেছে। নৃত্যটি বেশীরভাগ সময়েই চতুষ্কোন নকশা এবং বৃত্তাকারে করা হয়। বিজু গান ও নৃত্যের মধ্যে হঠাৎ করে ছেদ দিয়ে অর্থাৎ তাল বিহীনকরে পর মুহূর্ত্তেই দ্রুত লয়ে শুরু করে। এই বিজু নৃত্যটি খুব লাসাঙ্গের ভঙ্গীর মধ্য দিয়ে পরিবেশন করা হয়।

গারো উপজাতীদের ওয়াংলা নৃত্য

গারো উপজাতিদের আশ্বিন মাসে সমগ্র ফসল ঘরে উঠে যায়। তখন একটি পূজার আয়োজন করে বড় করে ভোজ দিয়ে তারপর নৃত্যানুষ্ঠান শুরু হয়। উৎসবটির নাম "ওয়াংলা"। সেই অনুসারে নৃত্যটির নাম "ওয়্যাংলা"। ওয়াংলা উৎসবটি ফসল কেন্দ্রিক উৎসব।

শিব হচ্ছেন গারো উপজাতিদের ফসলের দেবতা। যদিও শিবের কোন মূর্ত্তি পূজা এরা করে না। বড়ো জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাঁশকে গারো উপজাতিরা দেবতার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করে। বাড়ীর উঠোনে জালি বেত দিয়ে বাঁশের মধ্যে সুন্দর করে ঝরোকার মত তৈরী করে তাতে কচি পাতার ঝাড় সহ বাঁশ বসান হয় এবং এখানেই পূজা করা হয়।

যদিও গারো উপজাতিরা শিবকেই ফসলের দেবতা বলে অভিহিত করে, তবু ওয়াংলা উৎসবের সময় 'আসংতাতা' নামে কোন এক অদৃশ্য শক্তির কল্পনা করে পূজা করা হয়। তাদের বিশ্বাস এই অদৃশ্য শক্তি ফসল বৃদ্ধির সহায়ক। ওয়াংলা নৃত্যটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা -গ্রিকা, গুড়িরুনুয়া এবং দানিদখুরয়া। গারো পুরোহিত কামাল পূজা সমাপনান্তে এক হাতে মাল্লুম (তলোয়ার) এবং অপর হাতে 'সেপটি' (বাঁশের তৈরী ঢাল) নিয়ে ডানদিকে এবং বাঁদিকে কোমর দুলিয়ে দু'পা টেনে টেনে নৃত্য করে। নৃত্যের মাঝে মাঝে তলোয়ার আক্রমনের ভঙ্গীতে উত্তোলন করে। বাদ্যযন্ত্রবাদকরা তখন ধীর লয়ে বাজাতে থাকে। এই অংশটির নাম 'গ্রীকা'। কামালের এই তলোয়ার নিয়ে আক্রমনের ভঙ্গীটি দেখে মনে হয় যেন কোন অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। অর্থাৎ এই ফসল উৎসবের মধ্যে যাতে কোন অশুভ কিছুর কোপ না পড়ে তার বিরুদ্ধে কামালের এই আক্রমনাত্মক ভঙ্গীতে নৃত্য করা। কামালের ঢাল, তলোয়ার নিয়ে এই নৃত্যভঙ্গীটির মধ্যে যেন একটি যুদ্ধ নৃত্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নৃত্যের শেষ মুহূর্ত্তে কামাল ডাইনে, বায়ে সামনে, পিছনে ক্রমাগত তলোয়ার ঘুরিয়ে একসময় নৃত্যটি শেষ করে। অর্থাৎ গ্রামের অশুভ শক্তিকে দূর করে কামাল নৃত্যটি সমাপন করে।

এরপর শুরু হচ্ছে 'গুড়িরুনুয়া' । বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে ছেলে ও মেয়েরা দু সারিতে এসে একে অপরের কাঁধে হাত দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে দ্রুত লয়ে নৃত্য শুরু করে । এই সময় ডান পায়ে একবার পদক্ষেপ এবং বাঁ পায়ে একবার পদক্ষেপ দ্রুতভাবে নিয়ে অর্দ্ধবৃত্তাকারে নাচতে শুরু করে । এই নৃত্যে মেয়েরা এক সারিতে এবং পুরুষেরা অন্য সারিতে অর্থাৎ দুটো সারিতে নৃত্যটি করে । ছেলেদের ও মেয়েদের দুটো সারি মুখোমুখি হয়ে নৃত্য করে । বাদ্যযন্ত্র শিল্পীরা একসময় এসে নৃত্যে যোগ দেয় । কামাল ও এদের সামনে দুহাত তুলে দেহকে নানাভাবে বাঁকিয়ে নৃত্য করে এবং মাঝে মাঝে 'হেই' 'হেই' বলে চিৎকার করে ও সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে শিঙা বেজে উঠে । এরপর ওয়াংলা নৃত্যটির শেষ পর্যায়ে দানি দখ্‌স্থয়া খুব দ্রুত লয়ে নৃত্যটি চলা অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বিলম্বিত বা ধীর লয়ে চলে আসে । এই সময় দু হাত মুষ্টি বদ্ধ করে নীচের দিকে সোজা ভাবে রেখে এবং সেই সঙ্গে দেহ সামনে ইষৎ ঝুকে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে ডাইনে, বায়ে দেহ সঞ্চালিত করে অত্যন্ত ধীর লয়ে নৃত্যটি করতে থাকে । নৃত্যটির সময় একবার ডান পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে তাল দিয়ে পুনরায় ডান পা সমভাবে রাখে । আবার বাঁ পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে তাল দিয়ে বাঁ পা সমভাবে মাটিতে ফেলে এইরূপ পদক্ষেপ দিয়ে নৃত্যটি দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতে থাকে এবং নৃত্য চলাকালে নৃত্য অংশগ্রহন কারীদের মদ পরিবেশন করা হয় ।

পূর্বে বলা হয়েছে যে গারোরা শিবকে ফসলের দেবতা বলে অভিহিত করে । যখন তারা 'গুড়িরুনুয়া' ও 'দানিদখনুয়া' নৃত্যটি করে, তখন তাদের উপর দেবতার ভর হয় বলে তাদের বিশ্বাস । এদের নৃত্যের প্রথম অংশ গুড়িরুনুয়ার সময় দ্রুত তালে হাতের উপর ঢলে পড়া মাথাকে রেখে যেভাবে ওরা অগ্রসর হয়, তা দেখে মনে হয় যেন কোন কিছুর ভর হয়েছে । এমনকি বিলম্বিত লয়ের নৃত্যের সময় নৃত্যের অঙ্গ ভঙ্গীতে ও এই ভর হওয়ার ভাবটি পরিলক্ষিত হয় । ব্রোজিলে উপজাতিদের মধ্যে এই ধরণের নাচ দেখা যায় । তাছাড়া আরপাহো উপজাতীয়দের মহিলারা এই ভর নৃত্য করে থাকে ।

মগ উপজাতীদের 'পঙ্খু আকা' ও 'বিয়াসা' নৃত্য

ত্রিপুরায় বসবাসরত মগ ও উপজাতিদের মধ্যে "পঙ্খু আকা" নামে একটি নৃত্যের প্রচলন আছে । অতীতে মগ মহারাজাদের সামনে এই নৃত্য পরিবেশন করা হত । বর্তমানে নানা প্রকারের সামাজিক অনুষ্ঠানে এই নৃত্য করা হয় ।

নৃত্য বর্ণনা

চারজন মেয়ে হাতে রুমাল নিয়ে চতুষ্কোনে দাঁড়িয়ে বাঁ পা সম অবস্থায় রেখে ডান পা দিয়ে চার মাত্রার ছন্দে পদক্ষেপ দিয়ে নৃত্যটি করে। একহাত কোমরে রেখে, অন্যহাতে রুমালটি ঘুরিয়ে নৃত্য করে। রুমাল আন্দোলিত করে কখনও একজন অপরজনকে অতিক্রম করে। কখনও মুখোমুখি হয়ে রুমালটি নাড়াতে থাকে। আবার কখনও বৃত্তাকারে ঘোরে। চতুষ্কোনে ৪টি মেয়ে দাঁড়িয়ে প্রথম দুজন একহাত কোমরে রেখে অন্যহাতে রুমালটি উপরে নিয়ে হাত সঞ্চালন করে নীচে নামানোর সাথে পিছিয়ে যায়। পরবর্তী দুজন একই ভঙ্গী করে সামনে এগিয়ে যায়। পুনরায় নিজেদের স্থানে চলে আসে। পরের ভঙ্গীটিতে বৃত্তাকারে ৪টি মেয়ে রুমালটি সঞ্চালন করে ঘুরে ঘুরে নৃত্যটি সমাপ্ত করে।

বিয়াসা নৃত্য

এই নৃত্যটি মগদের মধ্যে আমোদ-প্রমোদের সময় করা হয়। কয়েকজন ছেলে কয়েকজন মেয়ের নিকটে গিয়ে ধাঁধাঁ জিজ্ঞাসা করে। প্রশ্ন ও তার প্রত্যুত্তর–এই নিয়েই নৃত্যটি এবং গান চলতে থাকে।

নৃত্য বর্ণনা

১ নং ভঙ্গী

ছেলেমেয়েরা দুই সারিতে কোমরে ধরে এসে নৃত্যস্থলে দাঁড়িয়ে চারমাত্রার ছন্দে পদক্ষেপ দিয়ে দেহকে আন্দোলিত করে।

২ নং ভঙ্গী

ছেলেরা একহাত উঠিয়ে, নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে চার মাত্রার ছন্দে পদক্ষেপ দিয়ে ধাঁধাঁ জিজ্ঞেস করার ভঙ্গী করে। মেয়েরা একইভাবে পদক্ষেপ নিয়ে, হাত সামনে অনেকটা মুষ্টি মুদ্রার মত করে ধাঁধাঁর উত্তর দেওয়ার ভঙ্গী করে

৩ নং ভঙ্গী

কোমরে ধরে বৃত্তাকারে ঘুরে এসে পরস্পর পরস্পরের পাশে কাঁধ বাঁকিয়ে দাঁড়ায়।

৪ নং ভঙ্গী

দুহাত অঞ্জলি মুদ্রার মত করে বৃত্তাকারে ঘুরে এসে মুখোমুখি হয়ে ঐ অঞ্জলি হস্তটিই সামনে প্রসারিত করে।

এইরূপ কিছুক্ষণ চলার পর দু'দলই হাতে তালি দিয়ে ঘুরে নৃত্যটি সমাপন করে।

"সাঁওতাল সম্প্রদায়ের 'দাঃ-বাপ্‌লা' নৃত্য"

ত্রিপুরায় যে সকল মুষ্টিমেয় সাঁওতাল সম্প্রদায় আছে তাদের মধ্যে বিয়ের জলভরা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে 'দাঃ বাপ্‌লা' নৃত্যটি প্রচলিত। নৃত্যটির পুরো নাম 'দাঃ বাপ্‌লা ঞ্জেনেচা'। 'দাঃ'-জল, 'বাপ্‌লা'-বিয়ে, 'ঞ্জেনেচ'-নাচ।

নৃত্য বর্ণনা

সাঁওতাল মেয়েরা থালা, জলের ঘট এবং তীর ধনুক নিয়ে ওদের চিরাচরিত ভঙ্গীতে নৃত্য শুরু করে। ওদের নাচের আকার (Form) একই প্রকার। সবসময়ই একটি কোনের সৃষ্টি করে নাচে এবং মুক্ত শৃঙ্খল (open chain) অবস্থায় নৃত্যস্থলটি প্রদক্ষিণ করে এসে হাতের জিনিষগুলো নামিয়ে রাখে।

২ নং ভঙ্গী

একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একজনের হাতের অঙ্গুলির ভিতর অপরজনের হাতের অঙ্গুলি সংযুক্ত করে সামনে ঈষৎ ঝুঁকে নৃত্যটি করতে থাকে। এই সময় পায়ের সঞ্চালন যথাক্রমে ডান পা পিছনে নিয়ে গিয়ে ঝুঁকে, আবার সামনে দুবার পা ফেলে বাঁ পা সামনে গোড়ালি দিয়ে আঘাত করে জায়গায় রাখে। এই সময় ওদের দেহ একবার সামনের দিকে ঝুঁকে আবার পিছিয়ে যায়।

৩ নং ভঙ্গী

এই ভঙ্গীতে পরস্পরের হাত ছেড়ে দিয়ে দুপাশে হাত রেখে একই পা ফেলে দ্রুতলয়ে করতে থাকে।

৪ নং ভঙ্গী

একইভাবে পা ফেলে দ্রুতলয়ের মধ্যে সামনের দিকে শরীর রেখে ঝুঁকে হাতে তালি দিয়ে উঠেই একজন অপরজনের পিছনে দাঁড়িয়ে কটিদেশ দুবার সঞ্চালন করে।

এইভাবে কিছুক্ষণ নৃত্যটি চলার পর হাতের মধ্যে পুনরায় থালা, জলের ঘট, তীরধনুক নিয়ে ১ নং ভঙ্গীর মত করে নেচে নৃত্যস্থল থেকে চলে যায়।

"ওঁরাও উপজাতিদের ফাগুয়া নৃত্য"

ত্রিপুরায় বসবাসকারী ওঁরাও সম্প্রদায়রা ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমার দিন 'ফাগুয়া' নাচটি করে। সারাদিন রঙ খেলার পর রাত্রিতে চাঁদের আলোয় ছেলে ও মেয়েরা মিলে এই নাচটি করে।

নৃত্য বর্ণনা

১ নং ভঙ্গী

ছেলে ও মেয়েরা দুহাতে দুটো কাঠি নিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে বৃত্তের ভিতরের দিকে ফিরে নীচুতে দুটো কাঠি বাজায়।

২ নং ভঙ্গী

বৃত্তের মধ্যে ঘুরে ঘুরেই একে অন্যের কাঠির সঙ্গে বাজিয়ে যায় ।

৩ নং ভঙ্গী

ছেলেরা বৃত্তাকারে বসে এবং মেয়েরা ছেলেদের কাঠিতে নিজেদের কাঠি দিয়ে তাল দিতে দিতে খুব দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে বৃত্তাকারে ঘোরে। অর্থাৎ মেয়েরা বৃত্তাকারে খুব দ্রুতভাবে ঘোরার সময় পাশে বসা প্রতিটি ছেলের কাঠিতে তাল দিতে দিতে ঘোরে। অনুরূপভাবে মেয়েরা বসে, ছেলেরা মেয়েদের কাঠিতে তাল দিতে দিতে বৃত্তাকারে ঘোরে।

৪ নং ভঙ্গী

মেয়েরা বৃত্তের ভিতর অপর একটি বৃত্ত রচনা করে বসে একবার নীচুতে কাঠি বাজিয়ে পুনরায় উপরে উঠিয়ে বাজায়। সেই সময় ছেলেরা মেয়েদের বৃত্তের বাইরে আর একটি বৃত্ত রচনা করে ঘুরে ঘুরে দুটো কাঠি দিয়ে একবার নীচে তাল দেয়, আবার মাথার উপরে তাল দেয়।

৫ নং ভঙ্গী

এরপর বৃত্তাকারে একে অন্যকে অতিক্রম করে পরস্পর পরস্পরের কাঠিতে বাজিয়ে–এই ভঙ্গীটি করে ঘুরতে থাকে।

এইভাবে কাঠি বাজিয়ে বিভিন্ন প্রকার নৃত্য নকশা করে এক সময় নৃত্যটি শেষ করে। এই নৃত্য নকশাগুলো খুবই বৈচিত্রপূর্ন। (১নং এবং ২ নং ভঙ্গীতে হরিবংশ

পুরানের দণ্ড রাসকম্ নৃত্যের ভঙ্গী সাদৃশ্য ও গুজরাটের ডাণ্ডিয়া রাস নৃত্যের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়)

মুণ্ডাদের ঝুমুর নৃত্য

ত্রিপুরার মুণ্ডা উপজাতিদের মধ্যে যাদুর্ (লাসুর) এবং গেনা এই তিনটি উৎসব প্রচলিত । কিন্তু দারিদ্রের নিপীড়নে ওরা কোন প্রকারে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জীবনধারন করছে । আর্থিক অনটনের জন্য উৎসবগুলো ভাভভাবে করতে পারে না । এদের যাদুর, লাসুর এবং গেনা উৎসবে যে নাচগুলো ছিল, তা চর্চ্চার অভাবে হারিয়ে গিয়ে শুধু 'ঝুমুর' নাচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে ।

ঝুমুর নাচ - নৃত্য বর্ণনা

প্রথমে পাঁচজন মুণ্ডা মহিলা পরস্পর পরস্পরের হাতে হাত ধরে ডান পায়ে পদক্ষেপ নিয়ে একবার সামনে ঈষৎ ঝুঁকে, পুনরায় পিছিয়ে–এইভাবে অর্দ্ধবৃত্তাকারে নাচতে থাকে । এদের সামনে দল নেতা মাথায় পাগড়ী জড়িয়ে, হাতে তাল দিয়ে গান করতে থাকে । তার পাশে একজন মধ্যবয়সী লোক ঢোলক বাজাতে থাকে । এইভাবে সামনে পিছনে শরীর দুলিয়ে মহিলারাও গান করতে থাকে । মহিলাদের মধ্যে একজন হাতে রুমাল নিয়ে নাচ করে । এইভাবে পরস্পরের হাতের মধ্যে দিয়ে কখনও অর্দ্ধবৃত্তাকারে, কখনও সরল রেখার সৃষ্টি করে নাচতে থাকে । যখন নাচটি দ্রুত গতিতে পৌঁছে যায় তখন পাঁচজন মহিলার মধ্যে দুজন নৃত্য থেকে বিরত হয়ে পড়ে । তিনজন মহিলা মিলে দ্রুতগতিতে ডান পায়ে পদক্ষেপ নিয়ে সামনে ঝুঁকে পিছিয়ে বাঁ পায়ে পদক্ষেপ নেয় । দ্রুত গতির সময় দল প্রধান যিনি এতক্ষন হাতে তালি দিয়ে গান করে নৃত্যের পরিচালনা করছিলেন, তিনি ঢোলক বাদকের থেকে ঢোলটি নিয়ে বাজিয়ে ওদের সামনে ঝুঁকে একই ভাবে নাচতে থাকে । পুনরায় ঢোলকটি ঢোল বাদকের নিকট দিয়ে, তিনজন মহিলার বিপরীত পাশে দাঁড়িয়ে তাদের মুখোমুখি হয়ে ঝুঁকে হাতে তালি দিয়ে নাচতে থাকে । তিনজন মহিলার মধ্যে প্রথম মহিলাটির হাতে একটি রুমাল ছিল, সেই রুমালটি একহাতে নাড়িয়ে, অন্যহাতে অপর মহিলাদের হাতে ধরে সামনে ঝুঁকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে নাচতে থাকে । এরপর তিনজন মহিলাই হাঁটুর উপর বসে প্রথম মহিলাটি তখন সামনে রুমাল নাড়িয়ে নাচতে থাকে । কিছুক্ষন বসে নাচ করে, পুনরায় দাঁড়িয়ে–এইভাবে নাচটি চলতে থাকে । একসময় দুজন মহিলা নাচ থেকে বিরত হয়ে যায় । একজন মহিলা রুমাল নিয়ে নাচতে থাকে । এইভাবেই একসময় নাচটির সমাপ্তি হয় ।

কুকী উপজাতিদের 'তাংগডাম' নৃত্য

ত্রিপুরায় বসবাসকারী কুকী উপজাতিদের মধ্যে পূর্বে নূতন ধান ঘরে আনার পর অগ্রহায়ন, পৌষ মাসে পূজা দেওয়া হত। পূজার শেষে ফসল ঘরে আসার প্রকাশ ঘটাতে ছেলে ও মেয়েরা মিলে তাংগডাম নাচটি করত। পূজা এবং নাচ দুটি ক্ষেত্রেই পুরোহিতদের প্রাধান্য ছিল। বর্তমানে যদিও পুজা-পার্বন আর নেই, তবু এই তাংগডাম নৃত্যটি রয়ে গেছে। যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে এই নৃত্যটি ওরা উপস্থাপনা করে থাকে।

তাংগডাম নৃত্য

কুকী সম্প্রদায়ের ১৫ অথবা ১৫ অথবা ১৩ জন মেয়ে একে অপরের পিছন দিকে হাত নিয়ে কটি দেশের উপর স্থাপন করে ডান পা সামনে এক মাত্রার ছন্দে রেখে বাঁ পা ডান পায়ের কাছে এনে পায়ের অগ্রভাগের উপর রাখে। পুনরায় বাঁ পা পিছনে এক মাত্রায় রেখে ডান পা নিয়ে বাঁ পায়ের কাছে পায়ের অগ্রভাগের উপর স্থাপন করে। এইরূপ পদ সঞ্চালন করে পরস্পর পরস্পরের কোমর ধরে খোলা শৃংখল (open chain) অনুসারে নাচতে থাকে। একজন ছেলে মেয়েদের দলের সামনে বসে পিতলের বড় গঙ (বেল্) 'দারখুং' বাজাতে থাকে। অপর একজন ছেলে নৃত্যরতা দলটির সামনে খুম্ বা ঢোলক বাজিয়ে গাইতে থাকে এবং নৃত্যের স্থান পরিবর্ত্তন করার জন্য মাঝে মাঝে নির্দেশ দেয়। (সম্ভবত ছেলেটি অচাই বা বল্পুর ভূমিকায় থাকে) এই তাংগডাম নৃত্যটি দীর্ঘক্ষন ধরে চলতে থাকে একই ভাবে। ডান পা সামনে রাখার সঙ্গে সঙ্গে দেহ একবার সামনে আসে, আবার পিছনে বাঁ পা রাখার সঙ্গে দেহটিকে পিছনের দিকে বাঁকিয়ে দেয়। এদের নৃত্যের যে আকার (form) তা অনেকটা সাঁওতাল, ওঁরাও দের মত। তবে একটু পার্থক্য আছে। যেমন সাঁওতালদের নাচের সময় শিল্পীরা সাধারনতঃ হাত দিয়ে কোমড় ধরে নাচে। কিন্তু তাংগডাম নাচের বেলায় দেখা যায় শিল্পীরা একে অন্যের পিছনে হাত নিয়ে ধরাধরি করে নাচে। সাঁওতালদের নাচে যে উদ্দামতা দেখা যায়, তা এদের নাচে পরিলক্ষিত হয় না। এই কুকী সম্প্রদায়ের থেকে সাঁওতাল, ওঁরাওদের পায়ে ভঙ্গীও কিছুটা জটিল। কিন্তু কুকী উপজাতিদের নাচের পদ সঞ্চালনের মধ্যে কোমলতা বা নমনীয়তা দৃষ্ট হয়।

দারলং সম্প্রদায়ের 'জ্যাঠলুয়াং' নৃত্য

ত্রিপুরায় কুকী উপজাতিদের প্রশাখা দারলং সম্প্রদায়ের প্রধান নৃত্য জ্যাঠলুয়াং (zathluang)। যে কোন উৎসবের পূর্বে এই নাচটি করা হয়। এই জ্যাঠলুয়াং

নাচটির মধ্যে কতকগুলো প্যাটার্ন আছে। অর্থাৎ এই নাচটি কয়েকটি পর্য্যায় বা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। একটি ভঙ্গী থেকে অপর একটি ভঙ্গীতে যখনই পরিবর্ত্তিত হচ্ছে, তখনই একটি নূতন নাম দেওয়া হচ্ছে। একথাও বলা চলে যে নামগুলোর অর্থ অনুসারেই ভঙ্গীগুলো করা হচ্ছে। এই প্যার্টান বা পর্যায়াগুলোর নাম যথাক্রমে – (১) পুয়ালবাচাংহেম (২) রিকিফচয় (৩) সাতেতুয়ালইনকাই (৪) আরতেতুয়ালফিত (৫) বাঠুইনদি (৬) ফনসিকইনুসুই।

জ্যাঠলুয়াং বা সাধারন নৃত্য

জ্যাঠলুয়াং

১নং ভঙ্গী

জ্যাঠলুয়াং শব্দটির অর্থ সাধারন অর্থাৎ সাধারন নৃত্য। যুবতীরা একসারিতে এসে একটি বৃত্ত রচনা করে দুই মাত্রা ছন্দের মধ্যে শুধু ডান পা সামনে এগিয়ে গোড়লীতে রেখে পুনরায় জায়গায় নিয়ে আসে।

২নং ভঙ্গী

একই ভাবে বা ভঙ্গীতে ডান পা সঞ্চালন করে নিজের জায়গায় রোরে।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে কোন উৎসবের পূর্ব্বে এই নাচটি করা হয়। অর্থাৎ উপরোক্ত ভঙ্গীটি প্রাক্ উৎসবের ভঙ্গী। এই ভঙ্গীটি দেখে মনে হয় 'সাধারন নাচ' এই অর্থে বলা হয়েছে যে তাদের যে কোন নাচ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে এই ভঙ্গীতেই নৃত্যটি শুরু হয়। এই ভঙ্গীটির মধ্যে কোন জটিলতা নেই। তাই মনে হয় প্রথমে ভঙ্গীটির নাম জ্যাঠলুয়াং বা সাধারন নাচ – এই নামকরন হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের নাম 'পুয়ালবাচাংহেম'।। এটি এক ধরনের পাখীর নাম। এই পাখীগুলো খাবার দেখে যেভাবে খুশীতে নাচে, তেমনি নুতন বছর আসার আনন্দে পাখীদের নাচের ভঙ্গীকে অনুকরন করে দারলং মেয়েরা নাচে।

অনুকরনমূলক নাচ

২নং ভঙ্গী "পুয়ালবাচাংহেম"

যুবতীরা চার মাত্রার ছন্দে একবার ডান পা বাঁপাকে অতিক্রমে করে, আবার বাঁপা ডান পাকে অতিক্রম করে যার যার নিজের জায়গায় রোরে।

অনুকরনমূলক নাচ (টিয় পাখী)

তৃতীয় পর্যায় 'রিকিফচয়' (টিয়া পাখী)। যখন জুমে ধান পেকে যায়, তখন টিয়া পাখীরা ধান ক্ষেতে খাবার আশায় লাফিয়ে লাফিয়ে নাচে, তেমনি নুতন ধানের আশায় এরাও টিয়াপাখীর মতই অঙ্গভঙ্গী করে নাচে।

৩নং ভঙ্গী 'রিকিফচয়'

যুবতীরা তিনবার পদক্ষেপ নিয়ে অগ্রসর হয় এবং বসে পড়ে। পুনরায় দাঁড়িয়ে একইভাবে নৃত্যটি করে। এভাবে চক্রাকারে নৃত্যটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুকরনমূলক নাচ (জন্তু)

চতুর্থ পর্যায় 'সাতেতুয়ালইনফ্রাই'। বনে বাস করে একপ্রকার ছোট জন্তুকে 'সাতেতুয়ালইনফ্রাই' বলা হয়। এই জন্তুদের বৈশিষ্ট্য কোন প্রকার শব্দ শুনলেই এরা নাচতে থাকে। এই জন্তুদের নাচের ভঙ্গীগুলো অবিকল অনুকরন করে দেখায় দারলং মেয়েরা।

৪নং ভঙ্গী সাতেতুয়ালইনফ্রাই

মেয়েরা বৃত্তের মধ্যেই অর্দ্ধেক বসে একপাশে শরীর বাঁকিয়ে একটু ঝুঁকে বাঁ পা সঞ্চালন করে ডান পা টেনে বৃত্তের ভিতরে এসে আবার ঝুঁকে অর্দ্ধেক বসে পুনরায় ডান পা সঞ্চালন করে বৃত্তের বাইরে চলে আসে। এই ভঙ্গীটিই ওরা বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে করে।

অনুকরনমূলক নাচ (মোরগ)

চতুর্থ পর্যায় 'আরতেতুয়ালফিত' ছোট ছোট মোরগরা যে ভাবে ধানের কুড়ো থেকে খুঁটে খায়, সেই ভঙ্গীটি অনুসরন করে নাচটি করা হয়।

৫নং ভঙ্গী 'আরতেতুয়ালফিত'

বৃত্তের মধ্যেই যুবতীরা চারবার পদ সঞ্চালন করে অগ্রসর হয়ে ডান পা ও বাঁ পা পর্যায়ক্রমে সামনে থেকে পিছনে টেনে আনে। অর্থাৎ কোন কিছু আঁচর কাঁটার ভঙ্গী করে। এই পদসঞ্চালনটি অনেকটা নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত 'ভৌমিচারী' চাষগতির মত (চাষগতি হচ্ছে ডান পা-কে সামনে রেখে তারপরই আবার পিছন দিকে টেনে আনতে হবে এবং সেই সঙ্গে বাঁ পা-কে ও সামনে পিছনে রাখতে হবে)

অনুকরনমূলক নৃত্য (ঘুঘু পাখী)

পঞ্চম পর্যায় 'বাঠু ইনদি' । 'বাঠু' - ঘুঘু পাখী এবং 'ইনদি' - প্রেম - দুটো ঘুঘু পাখী মুখোমুখি হয়ে প্রেম করছে এবং মাটি খুঁটে খাচ্ছে - এরই অনুকরণ করে এই পর্যায়ের ভঙ্গীটি করা হয় ।

৬নং ভঙ্গী 'বাঠুইনদি'

এই ভঙ্গীটিতে ৪টি যুবতী মুখোমুখি হয়ে হাঁটুর উপর হাত রেখে বসার ভঙ্গী করে লাফিয়ে একজন অপরজনের মুখোমুখি হয়ে আবার পিছিয়ে যায় । অর্থাৎ ঘুঘু পাখীর মত প্রেম নিবেদন করে । এই ভঙ্গীটির মাধ্যমে কখনও একে অন্যকে অতিক্রম করে ।

পরের ভঙ্গীতে একটি মেয়ে এসে ধানের প্রতীক হিসাবে মাটিতে একটি টাকার নোট রেখে দেয় । চারজন যুবতী হাঁটুতে বসে একইভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে নোটটির চারপাশে ঘুরতে থাকে এবং এই ঘোরার ফাঁকেই হঠাৎ করে একটি মেয়ে ডান পাশে দেহ বাঁকিয়ে মুখ দিয়ে মাটি থেকে নোটটি তুলে নেয় । অর্থাৎ ঘুঘু পাখী মাটি থেকে খাবার তুলে খাচ্ছে–এই ভঙ্গীটির মাধ্যমে তাই দেখানো হয় ।

৭ম পর্যায় - 'ফনসিকইনসুই' । 'ফ' - ঢাল । এই নৃত্যের মাধ্যেমে সাহসী যুবকরা যুদ্ধের পূর্বে শরীরের ক্লান্তি দূরীকরনের জন্য একটি ছোটখাট মহড়া দিয়ে নিত । তারই প্রাতরূপ এই নাচ । যুবকদের অনুকরন করে মেয়েরাই নৃত্যটি করে ঢালের পরিবর্ত্তে নৃত্যে হাত পাখা ব্যবহার করা হয় ।

৬নং ভঙ্গী 'ফনসিকইনসুই'

চারটি যুবতী এই ভঙ্গীটি রঘপায়িত করে, হাঁটুতে বসে চারজন যুবতী লাফিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটি করে পাখা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে হাত নীচে রেখে পাখা সঞ্চালন করতে থাকে ।

উক্ত সাতটি নৃত্যভঙ্গীর মধ্যে কোথাও হস্ত মুদ্রা ইত্যাদির প্রয়োগ নেই । কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কটি পার্শ্বদেশের ভঙ্গী করা হয় । এই ভঙ্গীগুলোর সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত পার্শ্বদেশের ৫টি ভঙ্গীর সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় । এই ছটি পর্যায়ের নৃত্য সাধারনত মেয়েরাই করে ।

এই নৃত্যে কোন সঙ্গীতের প্রয়োগ নেই । শুধু বৃন্দবাদনের সঙ্গে নাচ করা হয় । মেয়েদের এই নৃত্যটি বেশীভাগই পশুপক্ষীর গতিভঙ্গীকে অনুকরন করে করা হয়েছে । মেয়েদের নাচগুলোকে Mimicri-dance বা অনুকরন নাচও বলা যায় ।

মিজো উপজাতিদের চেরো নৃত্য

ত্রিপুরার মিজো উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচলিত নাচ হচ্ছে 'চেরোলাম'। 'চে' - পদসঞ্চালন (Step) 'রো' - বাঁশ, 'লাম' - নাচ অর্থাৎ বংশ নৃত্য।

পূর্বে মিজো উপজাতিদের মধ্যে এই 'চেরো' নৃত্য আচার-অনুষ্ঠান মূলক নৃত্য হিল। এই নৃত্যটি করার পিছনে মিজো উপজাতিদের একটি গভীর বিশ্বাস হিল।

চেরো নৃত্য করার পিছনে এই ধারনা ছিল যে যদি কোন গর্ভবতী মহিলা প্রসব হতে গিয়ে মারা যায় তাহলে তার এই দৈহিক যন্ত্রনা ও ক্লান্তি নিয়ে পৃথিবী থেকে স্বর্গের–এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা খুব কষ্টসাধ্য হয়। তাই গর্ভাবস্থার শেষ দিকে অথবা প্রসবের ঠিক আগে তার আত্মীয়-পরিজনেরা দলবদ্ধভাবে এই চেরো নৃত্যটি করত। এতে গর্ভবতী স্ত্রীলোকটির মনে আত্মবিশ্বাস তৈরী হত। মিজো উপজাতিদের দৃঢ় ধারনা ছিল যদি স্ত্রীলোকটি এই নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে মারা যায়, তাহলে সে তার সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং আনন্দ নিয়ে খুব সহজেই স্বর্গে যেতে পারবে। অর্থাৎ বাঁশ দিয়ে যে শব্দ এবং নৃত্যের ছন্দ তৈরী হয় তার ফলেই স্ত্রীলোকটির স্বর্গে পৌছান খুবই তাড়তাড়ি সম্ভব হয়। (এই ধারনাটি অনেকটা হিন্দুদের মৃত্যুর পর আত্মার বাঁরে সাঁকো দিয়ে স্বর্গে পৌঁান ধারনাটির সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়)

বর্ত্তমানে এই নৃত্যটি মিজো উপজাতিরা বিলিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করে। এই নৃত্যটিকে তাদের জাতীয় নৃত্য ও বলা যেতে পারে। এই নৃত্যটিতে শুধু মহিলারাই অংশ নিয়ে থাকে।

চেরো নৃত্য

নৃত্যস্থলে ৮ জন যুবক-যুবতী সুসজ্জিত চারজোড়া বাঁশ নিয়ে প্রবেশ করে আড়াআড়ি ভাবে আরও দুজোড়া বাঁশ রেখে ঐ ৮ যুবক-যুবতী গীটার বাদ্যের তালে তালে ঐ জোড়া বাঁশগুলো ধরে দুবার মাটিতে তাল ঠুকে দুবার দুটো বাঁশে ঠুকে। এইভাবে যখন বাঁশ দিয়ে তাল দিতে থাকে, তখন ৮ জন যুবতী মাথায় মুকুট পড়ে তালে তালে বাঁশের মধ্যে দিয়ে গা ফেলে নৃত্য করতে থাকে। নাচটির নৈপুন্য হচ্ছে যে যখনই বাঁশগুলো মাটিতে ঠোকা হয় তখনই বাঁশের ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে নাচ করতে হবে। যদি দুটো বাঁশে পরস্পর ঠোকার সময় বাঁশের ভেতর পা পড়ে, তাহলে পা ভেঙ্গে যাবে। কাজেই খুব সতর্কতা ও নৈপুন্যের সাথে নাচটি করতে হয়। এই নৃত্যের মধ্যে হাতের ভঙ্গী কিছু নেই। শুধু নৃত্য করতে করতে বাঁশের মাঝখানে নানারূপ বৈচিত্রপূর্ন নৃত্য নকশা তৈরী করে।

নৃত্য বর্ণনা

১ নং ভঙ্গী

৮ জন যুবতী প্রথমে দুটো সারিতে বাঁশের মধ্য দিয়ে আসা-যাওয়া করে।

২ নং ভঙ্গী

৮ জন যুবতী সোজা সমান্তরাল ভাবে একে অন্যকে অতিক্রম করে। এরপর কোনাকুনি ভাবে একে অন্যকে অতিক্রম করে যায়।

৩ নং ভঙ্গী

এবার ডান পাশে ৪ জন যুবতী মিলে একটি বৃত্ত রচনা করে এবং বাঁ পাশে অপর ৪ জন মিলে আর একটি বৃত্ত রচনা করে একই সঙ্গে দুটি বৃত্তে ঘুরে ঘুরে যুবতীরা নৃত্য করে।

৪ নং ভঙ্গী

বাঁশের মাঝে কোনাকুনিভাবে আসা-যাওয়ার সময় একটি রুমাল দুটো বাঁশের মাঝখানে ফেলে রাখে। পরবর্ত্তী নৃত্যশিল্পী ঐ রুমালটি তুলে নেয়।

৫ নং ভঙ্গী

খুব দ্রুতলয়ে বাঁশগুলোর মাঝে সবাই মিলে একটি বৃত্ত রচনা করে ঘুরতে ঘুরতেই নৃত্যটির সমাপ্তি ঘটে।

মিজো উপজাতিদের 'চেরো' নৃত্যটি ছাড়াও আরও দুটি নৃত্য সামাজিক বা উৎসবাঙ্গের নৃত্য বলে পরিচিত হয়েছে। নৃত্য দুটো হচ্ছে 'খোয়াল্লাম' এবং 'ছেইলাম'।

খোয়াল্লাম নৃত্য

খোয়াল্লাম নৃত্যটি একটি আবাহন মূলক নাচ (welcome dance)। গ্রামের বাইরে থেকে বিশেষ অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে নৃত্য করতে করতে গ্রামের ভিতরে নিয়ে আসে। এই নৃত্যে যুবক-যুবতী উভয়েই অংশ গ্রহন করে।

১ নং ভঙ্গী

খোয়াল্লাম নৃত্যটির প্রারম্ভে যুবক-যুবতীরা পিঠের উপর দিয়ে বড় একটি চাদর দিয়ে, সেই চাদরটি দুপাশে সামনের দিকে ধরে একসারিতে নৃত্যস্থলে প্রবেশ করে

এবং অনেকটা সাঁতারের ভঙ্গীতে ছয়বার অগ্রসর হওয়ার পর গায়ে আঁচড় কাটার ভঙ্গী করে এবং মুখে সাপের মত হিস্ হিস্ ধ্বনি করে এরা নৃত্য করে।

২ নং ভঙ্গী

এই সাঁতার কাটার ভঙ্গী করেই এরা একবার বৃত্তের কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে বসে। আবার কেন্দ্রাতিগ হয়ে দেহকে ছড়িয়ে দেয়।

৩ নং ভঙ্গী

একইভাবে মেয়েরা বৃত্তের ভিতর আর একটি বৃত্ত রচনা করে এবং ছেলেরা বৃত্তের বাইরে চলে যায়।

৪ নং ভঙ্গী

পুনরায় একই ভঙ্গীতে ছেলেরা বৃত্তের মধ্যে বৃত্ত রচনা করে এবং বৃত্তের বাইরে মেয়েরা চলে যায়।

এইভাবে কিছুক্ষন নৃত্য করে নৃত্য শিল্পীরা নৃত্যস্থল থেকে প্রস্থান করে।

এই নাচটির মধ্যেও কোন মুদ্রার প্রয়োগ নেই। এরা সবসময়ই দেহকে সামনে ঝুঁকিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে নাচ করে। দেহকে নীচু করে নাচার পিছনে মনে হয় একটি কারন আছে। তা'হল - 'মিজো' কথাটিই হল উচু পাহাড়ের মানুষ। পাহাড়ে উঠানামা করতে গেলেই একটু সামনে ঝুঁকে তা করতে হয়, সেই সঙ্গে হাঁটু ও অঙ্গ বাঁকান থাকে। ফলে এদের নাচেও এর ছাপ দেখা যায়। এরা শিকার প্রিয় উপজাতি। যে যতবার শিকার করতে পারত, সে ততবেশী বীর বলে পরিগনিত হত। কাজেই যারা যুদ্ধপ্রিয়, তাদের নাচে পায়ের চালনাই বেশী থাকে। হাতের কোন মুদ্রা এজন্য দৃষ্ট হয় না। (ত্রিপুরার কুকি এবং দারলং উপজাতিদের ক্ষেত্রেও এই বক্তব্যটি প্রযোজ্য। ওরা শিকার এবং যুদ্ধপ্রিয় উপজাতি। তাই ওদের নৃত্যে যতটা পায়ের কাজ লক্ষ্যনীয় সেখানে হাতের কোন ভঙ্গীই নেই।

ছেইলাম নৃত্য

এই ছেইলাম নৃত্যটি পূর্বে রাজার সামনে করা হত। এখন যুবক-যুবতীরা যেকোন আনন্দনুষ্ঠানে নৃত্যটি করে। 'ছেই' - ধ্বনি। এই শব্দটি নৃত্যের সময় মাঝে মাঝে করা হয়। 'লাম' - নাচ। নৃত্যটি রাজার সামনে করাকালীন মুখ দিয়ে আনন্দের একটি ধ্বনি বের করে নাচা হত। ধ্বনিটি হচ্ছে 'ছেই'। (অনুরুপ পদ্ধতি পুরুলিয়ার 'ছৌ' নাচে দেখা যায়। সেখানে ঢোলক বাদক বাজনার সাঙ্গ এসে চীৎকার করে 'ছৌ' অক্ষরটি উচ্চারণ করে।

যুবক-যুবতীরা নৃত্যস্থলে বৃত্তাকারে হতে তালি দিয়ে গান করতে থাকে। হঠাৎ করেই একটি যুবক উঠে এসে মুখে 'ছোই' 'ছোই' শব্দ করে হাঁটু ভেঙ্গে দুহাত দুপাশে প্রসারিত করে নাচতে থাকে। কখনও একহাত দিয়ে, কখনও দুহাত আন্দোলিত করে শরীরকে নানাভাবে বাঁকিয়ে অল্প অল্প লাফিয়ে নাচতে থাকে। এরপর অন্যপাশ থেকে অপর একটি ছেলে উঠে এসে ঠিক একইভাবে নাচতে থাকে। এবং নাচ চলাকালীন বসা অবস্থা থেকে হাত ধরে একটি যুবতীকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। মেয়েটি ও ঠিক একই ভঙ্গীতে দুহাত পাখীর ডানার মত মেলে দিয়ে নাচতে থাকে। প্রথম যুবকটি বসে পড়ে। পুনরায় অন্য একটি যুবক একইভাবে উঠে এসে কিছুক্ষন নাচ করে অপর একটি যুবতীকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। সেই মেয়েটিও পাখীর পাখা সঞ্চালনের মত দুপাশে হাত নাড়িয়ে হাঁটু ডেঙ্গে নাচ করে। এইভাবে একের পর এক যুবকরা উঠে আসে এবং একের পর এক যুবতীকে উঠিয়ে নিয়ে নাচ করতে থাকে। ছেলেরা ও মেয়েরা যখন নাচতে থাকে, তখন ওদের চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরে বসে থাকা অন্য যুবক ও যুবতীরা হাতে তালি দিয়ে উৎসাহ দিতে থাকে। (পাঞ্জাবের একটি লোকায়ত নৃত্যের ভঙ্গী সঙ্গে এদের নৃত্যের ভঙ্গীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মত)।

যুবক-যুবতীদের আনন্দোচ্ছাস প্রকাশই প্রধান বৈশিষ্ট্য অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুবকরা এই নৃত্যটির সময় খুব সুন্দরভাবে দেহ নৈপুন্য প্রকাশ করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাসে আদিতে রয়েছে আদিবাসী নৃত্যাবলী বা Tribal dance ।আর সব শেষে রয়েছে নব্য উচ্চাঙ্গ বা Neo-classical dance । কোথাও নৃত্যকলা এখনও আদিম পর্যায়ে রয়ে গেছে । কোথাও নৃত্যকলা লোকনৃত্যের পর্যায়ে চলে এসেছে । আর কোথাও classical নৃত্যে উন্নীত হয়েছে । বিভিন্ন জায়গায় নৃত্যকলা বিভিন্ন পর্যায়ে বা স্তরে রয়ে গেছে তার কারণ হল মানুষের বিকাশের ধারায় কোথাও জ্ঞান -বুদ্ধি স্ফুরনে মানুষ আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে । কোথাও কোথাও মানুষ এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে । এই ব্যবধান দেশ, কাল ভেদে যেমন দেখা যায় তেমনি একটি অঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেও দেখা যায় ।

ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্যেও দেখা যায় যে কোন কোন উপজাতির নৃত্য অনেকটা উন্নত স্তরে এসে পৌঁছেছে আবার কোন উপজাতির নৃত্য কিছুটা আদিম পর্যায়েই রয়ে গেছে ।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে Tribal নৃত্য থেকে ধীরে ধীরে উন্নত হয়ে Classical নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছে । যেমন ভারতবর্ষের উচ্চাঙ্গ নৃত্য যথা ভরতনাট্যম, কথাকলি, কত্থক, মনিপুরী কুচিপুরী প্রভৃতি নৃত্যগুলো এসেছে লোকনৃত্য থেকে । এই লোকনৃত্যের বুনিয়াদী ভঙ্গীগুলো উচ্চাঙ্গ নৃত্যকে গঠন করতে সাহায্য করেছে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় – যেমন ভরতনাট্যম নৃত্যের উৎপত্তি হয়েছে সাদির নাট্য ও কুরুভঙ্কী নামে দুই লোকনৃত্য থেকে । এই সাদির নাট্য ও কুরুভঙ্কী নৃত্যভঙ্গী থেকে ভরতনাট্যম নৃত্যের আঢাউ বা বুনিয়াদী ভঙ্গীগুলোর জন্ম হয়েছে ।

কথাকলি নৃত্যের উৎপত্তির মূলেও কেরালায় প্রচলিত প্রায় সবরকমের 'কলি' নৃত্য থেকে কথাকলি নৃত্যের জন্ম হয়েছে ।·এই কলি নাচগুলির বুনিয়াদী ভঙ্গীকে 'কলাসম' বলা হয় ।

মনিপুরী নৃত্যের বুনিয়াদী ভঙ্গী হল চালি ।

ত্রিপুরাতে উপজাতিয় নৃত্যগুলোর মধ্যে কতগুলো বুনিয়াদী ভঙ্গী আছে । যেগুলোকে কেন্দ্র করে তাদের নাচগুলো তৈরী হয়েছে । এই বুনিয়াদী ভঙ্গী গুলোর ককবরক ভাষায় পৃথক পৃথক কতগুলো নাম আছে । সমগ্র ত্রিপুরায় প্রচলিত উপজাতীয় নৃত্যগুলির সবগুলিই প্রায় এই বুনিয়াদী ভঙ্গীর উপর নির্ভরশীল ।

নাট্যশাস্ত্রেও এবং অভিনয় দর্পনে যেমন পাদকর্ম, শিরোভেদ, হস্তমুদ্রা করন রেচক প্রভৃতির পরিচয় আছে। তেমনি ত্রিপুরার উপজাতির নৃত্যের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। যথা–

পাদকর্মের ভঙ্গী হচ্ছে 'কাইসা' , 'কনাই', কৌথম অর্থাৎ এক দুই তিন পদচালনা করে ত্রিভূজাকৃতি করা।

এরপর কটিকর্ম। যথা – কাইব্রই অর্থাৎ চার। এই সময় কটিদেশকে গোলাকৃতি ভাবে দোলাতে থাকে।

তারপর হস্তকর্ম। যথা 'কাইবা' অর্থাৎ পাঁচ। এই সময় ওরা হাত উভয়পার্শ্বে চালনা করে।

শেষ অংশটি গ্রীবা ও শিরকর্ম। যথা 'কাইদক' অর্থাৎ ছয়´ এই সময় দুপাশে গ্রীবা চালনা এবং মস্তিষ্ককে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে আনা হয়।

এই কাইসা, কৌনই, কৌথাম, কাইব্রই, কাইবা , কাইদক – এই ছটি ভঙ্গী হচ্ছে ত্রিপুরার উপজাতি নৃত্যের বুনিয়াদী ভঙ্গী। অর্থাৎ এই ছটি ভঙ্গীর উপর নির্ভর (base) করেই ত্রিপুরার উপজাতি নৃত্য গড়ে উঠেছে। ত্রিপুরার উপজাতিদের নৃত্যের কারুকুশলতার মৌল উপাদান এই সামান্য কয়েকটি ভঙ্গী – ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতীয় নৃত্যে দেখা যায়।

ত্রিপুরার উপজাতি রিয়াং উপজাতী, রুপিনী সম্প্রদায়, কলই সম্প্রদায়, কলই সম্প্রদায় -এদের নাচগুলিরমধ্যে খুব দ্রুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ত্রিপুরী উপজাতি এবং রিয়াং উপজাতিদের নাচ খুবই সমৃদ্ধশালী। এছাড়া জমাতিয়া উপজাতিদের বিশেষ একটি দল – যথা তেলিয়ামুড়ার মোহরছড়ার জমাতিয়া দলের গড়িয়া নৃত্য এবং সাব্রুম মহকুমার ফুলছুড়ির গ্রামে অবস্থিত নোয়াতিয়া সমপ্রদায়ের একটি দলের জুম নৃত্যটির মধ্যেও বেশ পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

এই উপজাতিদের নৃত্যগুলির প্রথম পর্যায়ে –বলা যেতে পারে আজ থেকে ৫০ বছর পূর্ব্বে এই নৃত্যগুলোর মধ্যে মুদ্রার ব্যবহার প্রায় ছিল না। যেমন জুম নাচে ধান কাটার ভঙ্গীতে বা হাত মুষ্টি বদ্ধ করে ধান গাছে ধরার ভঙ্গী করে। ডান হাতের দা দিয়ে ফসল কাটার ভঙ্গী করে। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। শুধু দুহাত পাশাপাশি রেখে ডান পাশে বাম পাশে দুবার নাড়ান। বাঁপাশে দুবার নাড়ান হত। ধান মাড়াই করার মধ্যে ও এত পায়ের কাজ ছিল না। অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে

পারে সেই সময়ের নাচগুলোর মধ্যে বিশেষ কোন শিল্পগত সৌন্দর্য্য ছিল না। দৃষ্টিনন্দন কোন উপাচার তখন এই নৃত্যগুলোর মধ্যে ছিল না। পরবর্ত্তীকালে এই উপজাতিরা বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিয়ে, প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে নৃত্য করে এবং তারা নিজেদের চিন্তাধারাকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে নৃত্যে এর সংমিশ্রন ঘটিয়ে শিল্প সুলভ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করতে শুরু করে। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ আমরা উপরে বর্ণিত উপজাতিদের নৃত্যে এর প্রকাশ দেখতে পাই।

এদের গড়িয়া নৃত্যের পধ্যেই সবচেয়ে বেশী মুদ্রার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন কপিত্থ, সূচীমুখ, পতাকা, মুকুল, মুষ্টি, কর্কট, পদ্মকোষ উর্ণনাভ ইত্যাদি মুদ্রা, এছাড়া দুটো -তিনটে ভৌমচারী, দুএকটা মণ্ডল, নৃত্যে দাঁড়াবার অবস্থান ইত্যাদি দেখা যায়। তবে এই মুদ্রা, চারী, মণ্ডল ইত্যাদির একটি আকার এদের নাচে পরিলক্ষিত হয়। উপজাতিরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেই মুদ্রা ইত্যাদির ব্যবহার করেছে। এগুলোর ব্যবহারই হচ্ছে তাদের উন্নত ধরনের চিন্তার ফলশ্রুতি।

ত্রিপুরী উপজাতিদের নৃত্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় জুম, লেবাঙ্গবুমানি, মসকসুমানি ইত্যাদি নৃত্যের মধ্যে মুখের অভিব্যক্তিতে অভিনয়ের প্রকাশ। অনেক ত্রিপুরী দলে জুম নাচে অচাই এর ভূমিকায় যিনি অংশগ্রহণ করেন, তিনি অভিনয়ের দ্বারা প্রথম অংশটি উপস্থাপনা করেন। এছাড়া জঙ্গল দেখা, জঙ্গল পছন্দ না হওয়াতে হতাশা, দা দিয়ে হাত অথবা পা কেটে ফেলা ইত্যাদি অংশগুলিতে অভিনয়ের প্রাবল্য লক্ষ করা যায়। লেবাঙ্গবুমানি নৃত্যটিতে পোকা খোঁজা, দেখা এবং হঠাৎ দেখতে পাওয়া ইত্যাদি অভিনয় দ্বারা নৃত্যের মধ্যে প্রকাশ করা হয় অভিনয় তখনই আসে নৃত্যের মধ্যে কাহিনীর প্রবেশ ঘটে।

মূলতঃ লোকনৃত্যের কোন ঘটনা বা কাহিনী থাকেনা। কিন্তু ত্রিপুরার ত্রিপুরী উপজাতিদের নৃত্যে কখনও কখনও মানব জীবনের ছোটখাট কাহিনীর ইংগিত পাওয়া যায়। এই ইংগিতের মধ্যে আমরা দুটো জিনিষ লক্ষ্য করি। (১) অনুকরণ মূলক নাচ যা আদিম নৃত্যকলার অনুকরণ মূলক যাদু বিশ্বাস বলে পরিচিত হয়ে থাকে। (২) এযেন অনেকটা নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত "উপরূপকের" আভাস দিচ্ছে।

ত্রিপুরার রিয়াং উপজাতিদের হজাগিরি নৃত্যের একটি বিশেষ ভঙ্গী হচ্ছে থালার উপর দাঁড়িয়ে (পূর্ব্বে বর্ণিত) পা দিয়ে থালা চালনা করে নৃত্যস্থলটি প্রদক্ষিণ করা। থালার উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য করার এই বিশেষ ভঙ্গীটি শাস্ত্রীয় কুচিপুরীতে দেখা যায়। কুচিপুরী নৃত্যশিল্পী অবশ্য থালার উপর দাঁড়িয়ে, থালা চালনা করে ঘুঙ্গুরের মাধ্যমে পায়ের বিভিন্ন কাজ দেখায়। সেইসঙ্গে হাতের ও নানারকম সঞ্চালন করে থাকে।

নৃত্যটি যেহেতু শাস্ত্রীয় তাই এতে নান্দনিক চেতনা ও মননশীলতার সংযোজন ঘটেছে । কিন্তু উপজাতিয় নৃত্যে সেটা আশা করা যায় না । তথাপি বোতল মাথায় নিয়ে, দুহাতে দুটো থালা ঘুরিয়ে, থালার উপর দাঁড়িয়ে চালনা করে নৃত্যটিতে কুশলতা এবং চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে । রাজস্থানে প্রচলিত এবং বিখ্যাত একটি লোকনৃত্যের মধ্যেও দেখা যায় থালায় অনেকগুলো প্রদীপ বসিয়ে মাথার উপর রেখে, অপর একটি থালার উপর দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে নৃত্যশিল্পী নাচতে থাকে । এর থেকে দুটো জিনিষ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় ।

(১) পূর্ব্বে এইসব শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার মূল ভিত্তি ছিল Tribal বা উপজাতীয় নৃত্য । (২) পৃথিবীর সমস্ত উপজাতীয় নৃত্যের মূল উৎসগুলো একই সূত্রে গাঁথা ।

ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী সকল উপজাতীয় নৃত্যের মধ্যে ভঙ্গীর নানারকম বৈচিত্র থাকলেও ঐ ভঙ্গীগুলোর মধ্যে একটা ঐক্য (Unity) খুঁজে পাওয়া যায় । নৃত্যতত্ত্বে একেই বলা হয় Unity of action .

ত্রিপুরার মধ্যে যে সব সংখ্যালঘু উপজাতি আছে তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক প্রভাব পড়েছে । যেমন সাঁওতালদের 'দাঁ বাপলা' নৃত্যের দুএকটি ভঙ্গীর মধ্যে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের নৃত্য ভঙ্গিমার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । এছাড়া কোন সম্প্রদায় যে স্থলে বসবাসরত, সেখানে অন্যকোন সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত হলেও তাদের উপর সেই সম্প্রদায়ের নৃত্যের প্রভাব পড়ে । যেমন সাব্রুম মহকুমার ফুলছড়ি গ্রামে নোয়াতিয়া সম্প্রদায় জুম চাষের পর লক্ষীপূজার নৃত্যের মধ্যে রিয়াং উপজাতিদের মত কলসীর উপর দাঁড়িয়ে নৃত্যটি সমাপন করে । এছাড়া বর্ত্তমানে কোন কোন উপজাতিদের বাদ্যযন্ত্র এবং পোষাকের ক্ষেত্রেও আধুনিক সংযোজন লক্ষ্য করা যায় । যেমন চাকমা উপজাতি এবং মগ উপজাতিরা নৃত্যের সময় হারমোনিয়ম ব্যবহার করে । মিজো এবং দারলং ও হালাম উপজাতিরা নৃত্যের সময় গীটার যন্ত্রটি ব্যবহার করে ।

এছাড়া গারো উপজাতি এবং রুপিনী সম্প্রদায়ের মেয়েরা নৃত্যের সময় বক্ষ্যের উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে একটি ওড়না বাঁধে । গারো, রুপিনী এবং মগ উপজাতিদের নৃত্যের মধ্যে যাত্রায় ব্যবহৃত বাংলা নাচের কিছুটা প্রভাব দেখা যায় ।

ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে ত্রিপুরী উপজাতি ও রিয়াং উপজাতিদের নাচই সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধশালী । ত্রিপুরী উপজাতিদের নাচে তাণ্ডবাংগের ভঙ্গীর প্রাধান্য বেশী দেখা যায়, তেমনি রিয়াংদের নাচে লাস্যের প্রভাব দেখা যায় । একদিকের নৃত্যে যেমন বজ্রকঠিন রূপটি ফুটে উঠে, অন্যদিকে তেমনি কোমলতা, পেলবতা ভরা নৃত্য আমরা প্রত্যক্ষ করি ।

নাট্যশাস্ত্র রচয়িতা ভরতমুনি এবং অভিনয় দর্পনের রচয়িতা নন্দিকেশর এইসব মুদ্রা্ পাদভেদ, মণ্ডল, ভৌমচারী ইত্যাদির নামকরণ, সংখ্যা এবং প্রয়োগ বিধিগুলো নিজেরা সৃষ্টি করেন নি। পূর্ব্বে বর্ণিত ভারতীয় নৃত্যকলার ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাসে যে পাঁচটি ধারা বয়ে এসেছে Tribal, Quasi Folk, Classico-Folk, Classical, Neo-Classical) এর মধ্য থেকেই মুদ্রা ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকা থেকেই মুদ্রা, পাদভেদ , মণ্ডল, চারী ইত্যদির সৃষ্টি হয়ে মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নান্দনিক চেতনায় পরিপুষ্ট হয়ে বিশুদ্ধ রুপ বা আকার ধারণ করেছে। আদিম মানুষ ধীরে ধীরে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের সমৃদ্ধ চিন্তা চেতনা মিশিয়ে নিয়ে নৃত্যের ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন করেছে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে মানুষের অগ্রগতির মতোই এই নৃত্যকলার পরিবর্তন কোথাও খুব দ্রুত হয়েছে, কোথাও আবার খুব ধীরে ধীরে এর অগ্রগতি হচ্ছে। আবার কোথাও এই নৃত্যকলা একেবারেই প্রাথমিক স্তরে স্তরে রয়ে গেছে। অর্থাৎ এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ দেখা যাচ্ছে কোথাও নৃত্যকলা Classical বা শাস্ত্রীয় নৃত্যের পর্যায়ে এসেছে। কোথাও Folk বা লোক পর্যায়ে্ আবার কোথাও Tribal বা উপজাতি নৃত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। আজকের শাস্ত্রীয় নৃত্যের মূলে যে base বা ভিত্তি, তা রয়ে গেছে Tribal বা উপজাতীয় নৃত্যের মধ্যেই। এর প্রমান স্বরূপ দেখা যায় পূর্ব্বে বর্ণিত ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতিয় নৃত্যের মধ্যে মুদ্রা, ভৌমচারী, মণ্ডল ইত্যাদির সঙ্গে নৃত্য ব্যকরন গ্রন্থ 'নাট্যশাস্ত্র' এবং 'অভিনয় দর্পনে' উল্লেখিত মুদ্রা, ভৌমচারী, মণ্ডল ইত্যাদির সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়।

ত্রিপুরার নৃত্যগুলো উপজাতীয় নৃত্য থেকে লোকনৃত্যের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ত্রিপুরী এবং রিয়াং সম্প্রদায়ের লোক নৃত্য আশা করা যাচ্ছে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আরও উন্নত হয়ে Classico Folk এর পর্যায়ে পৌঁছাবে।

তবে এই জন্য দরকার অনেক গবেষণা, সমস্ত উপজাতীয় নৃত্যগুলো সংগ্রহ করা, উপজাতীয় নৃত্য এবং লোক নৃত্যের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় করা উচিত। যেখানে ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্যগুলোর নিয়মিত চর্চা করা হবে। কারণ চর্চ্চার অভাবে ত্রিপুরার অনেক উপজাতীয় নৃত্য হারিয়ে যাচ্ছে।

ত্রিপুরার সমগ্র উপজাতীয় নৃত্যগুলো নিয়ে যদি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষনা চালান যায়; তাহলে আশা করা যাচ্ছে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের শাস্ত্রীয় নৃত্যের পাশাপাশি ত্রিপুরার উপজাতী নৃত্যকলা ও একটি নূতন রূপ ধারন করতে সক্ষম হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। W. D. Humbly, Tribal dancing and Social development, London, 1926 .

২। সৌরিন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় 'ভাষার জন্মকথা' মাসিক বসুমতী । বৈশাখ, ১৯৪২ ।

৩। ওয়াকিল আহমেদ 'বাংলার লোক সংস্কৃতি' , ঢাকা, ১৯৭৪ ।

৪। Kirat -Jana -kriti (Dr, S. K. Chatterjee, J. O. A. S. B. letters. Vol. XVI No-2 1950)

৫। Tribal history of Eastern India, E. T. Dalton, Delhi, 1973.

৬। Socio Economic Adjustment of Tribals", Bani Prasanna Misra . People"s Publishing House, New Delhi-1973

৭। Debapriya Deb Barma. Treatise on traditional Social Institutions of The Tripura Community, Direcorate of Research, Govt. of Tripura . 1983.

৮। The Jamatiya of Tripura., Pradip Nath Bhattacharjee, Govt. of Tripura. 1983.

৯। The Hill Tracts of Chittagang and the Dwellers therein — T. H. Lewin, Calcutta Bengal Printing Co. 1896.

১০। সেন্সাস বিবরণী । ঠাকুর শ্রী সৌমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম কর্তৃক সম্পাদিত । ১৯৩৩ ।

১১। The Rings of Tripura Dr. Jagadish Ganchoudhury, Govt. of Tripura. 1983 .

১২। 'সাধারণ সমীক্ষার আলোকে উছই' শ্যামলাল দেববর্মা । গবেষণাধিকার, উপজাতি ও তপশীল জাতি কল্যান দপ্তর, আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৯৮৩ ইং

১৩। Tribe and castes of Bengal . Sir Harbert Risely. Calcutta. 1891 .

১৪। চাকমা জাতি । সতীশ চন্দ্র ঘোষ । কলিকাতা । ১৯৩৫ ।

১৫। 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' । বিরাজ মোহন দেওয়ান্ নিউরাঙ্গামাটি, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম । প্রথম সংস্করন -১৯৬৯ ইং

১৬। 'Account of the Arkan Journal of the Asiatic Society of Bengal ' . Lt. Col. Phayre. Vol- X 1841

১৭। Census of India. 1961. Vol, XXVV. Tripura Part-VA

১৮। 'Tripura ' . Omesh Saigal. 1978. Concept Publishing Company.

১৯। Indian Tribes . M. Chakraborty & D. Mukherjee. Sawrasati Library. 1971.

ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্য সমীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী যাদের থেকে নেওয়া হয়েছে তাঁদের নাম নিম্নে দেওয়া হল।

	দলনেতা বা নৃত্য শিক্ষকের নাম	ক্ষেত্র সমীক্ষা কোথায় করা হয়েছে
১।	শ্রী মঙ্গল দেববর্মা	
	ও	পূর্ব চাম্পাহাওর গাঁওসভা,
	শ্রী রবিচরন দেববর্মা	খোয়াই মহকুমা
২।	শ্রী বুধারাই দেববর্মা	জয়জয়নগর, রাধাপুর গাঁওসভা, সদর
৩।	শ্রী সুবোধ দেববর্মা	
	ও	বর্দ্ধমানঠাকুর পাড়া, সদর।
	শ্রী রবিকুমার দেববর্মা	
৪।	শ্রী অখিল দেববর্মা	
	ও	
	শ্রী যামিনী দেববর্মা	রাধাপুর জিরানিয়া ব্লক,
	এবং	সদর।
	শ্রী সুনীল দেববর্মা	
৫।	শ্রী আনন্দ মোহন দেববর্মা	
	ও	মোহনভোগ, সোনামুড়া
	শ্রী সুবর্ণ দেববর্মা	
৬।	শ্রী কাশীরাম দেববর্মা	তৈজলিঙ, সোনামুড়া।
৭।	শ্রী অভিচরণ দেববর্মা	বাইজলবাড়ী, খোয়াই।
৮।	শ্রী চন্তাই দেববর্মা	
	ও	সিপাহীপাড়া, কামলঘাট
	শ্রী রমেশচন্দ্র দত্ত	
৯।	শ্রী ব্রজবাসী দেববর্মা	মাইট্যাবাড়ী, মোহনপুর ব্লক, সিমনা।

১০।	শ্রী সুবোধ লাল জমাতিয়া শ্রী বৃন্দাবন জমাতিয়া এবং শ্রীমতী বিক্রমরাণী জমাতিয়া	মোহরছড়া (মোহরবাড়ী) ব্লক -তেলিয়ামুড়া, খোয়াই মহকুমা ।
১১।	শ্রী হরিমিলন জমাতিয়া শ্রী পবিত্রভক্তি জমাতিয়া	জইং বাড়ী, পোঃ কিল্লা, উদয়পুর
১২।	শ্রী কৃষ্ণ বাহাদুর জমাতিয়া	ধূপতলী গাঁওসভা, জমাতিয়া পাড়া, উদয়পুর ।
১৩।	শ্রী মংকরই ত্রিপুরী	ফুলছড়ি, সাতচাঁদ ব্লক, সাব্রুম ।
১৪।	শ্রী বুধরাম রিয়াং	বাইখোরা, বিলোনিয়া ।
১৫।	শ্রী সত্যরাম রিয়াং	দশমী রিয়াং পাড়া, গুলাইছড়া গ্রাম, বিলোনিয়া ।
১৬।	শ্রী গঙ্গাধর রিয়াং	বেতছড়া গ্রাম, কৈলাশহর ।
১৭।	শ্রী ভগীরথ রিয়াং	ভগীরথ রিয়াং চৌধুরীপাড়া, পানগুয়া গাঁওসভা, কমলপুর ।
১৮।	শ্রী খগেন্দ্র উছই ও শ্রী ইরাধন উছই	ধনচন্দ্র উছই কলোনী পাড়া,পশ্চিম মানিক্য গাঁওসভার অন্তর্গত, অমরপুর
১৯।	শ্রীনাইলুয়ারিল হালাম এবং শ্রীনিয়াজম হালাম	গ্রাম -জইতাং , জেলা - ধর্মনগর, পোঃ বাগবাসা, উত্তর ত্রিপুরা ।
২০।	শ্রী মুংকরই রুপিনী	হাওয়াই বাড়ী, তেলিয়ামুড়া ।
২১।	শ্রী ইন্দ্র কুমার কলই এবং শ্রী শান্তি কলই	ব্রক্ষছড়া গ্রাম, গাঁওসভা - উত্তর গোকুলপুর , ব্লক- তেলিয়ামুড়া ।
২২।	শ্রী ব্রজেন্দ্র কলই	বৈশ্যমুনি পাড়া, অম্পি, অমরপুর
২৩।	শ্রী আন্ত্রিয়ো মরশুম ও শ্রী বীণা বাহাদুর মরশুম	তৈজলং বাড়ী, অমরপুর মহকুমা ।
২৪।	শ্রী বিষ্ণুমোহন মরশুম শ্রী জিতু বাহাদুর মরশুম	গাঁওসভা -লক্ষণঢেপা, ধ্বনিকুমার মরশুম পাড়া, সোনামুড়া মহকুমা
২৫।	শ্রী ফুলেশ্বর চাকমা	নবীনছড়া, ধর্মনগর ।

২৬।	বিমল চাকমা	মাছমারা, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা
২৭।	শ্রী থৈ থৈ চৌধুরী	রুপাইছড়ি (সাব্রুম)
		কলসী (বিলোনিয়া)
		বাইখোরা (বিলোনিয়া)
২৮।	শ্রীমতী জ্যোৎস্না রেমা	সিপাহীজলা সদর
২৯।	শ্রী থরিন্দ্র সাংমা ও	কচুছড়া (সাংমা পাড়া),
	শ্রীমতী মঞ্জুরী সাংমা	সালেমা ব্লক , কমলপুর
	এবং	উত্তর ত্রিপুরা ।
	শ্রী প্রভঞ্জন সাংমা	
৩০।	শ্রীমতী সুররযমণি সাঁওতাল	বেলছড়া , খোয়াই ।
৩১।	বীরসা মুণ্ডা	তালতলা বিনোদিনী চা বাগান,
		সদর উত্তর
৩২।	শ্রী প্রেমসিং ওঁরাও	প্রমোদনগর, খোয়াই ।
৩৩।	শ্রী বিদ্যা খাসিয়া	গ্রাম-দাতুছড়া, কৈলাসশহর ।
৩৪।	শ্রী লালজী ডিঙ্গামাইলু	ভাংগমুন, জম্পুই পাহাড় ।
৩৫।	শ্রী ভাইয়া কুকী	ধূপতলী গাঁওসভা, উদয়পুর ।
	শ্রী থাটকারা কুকী	
	শ্রী লালথাক কুকী	
৩৬।	শ্রী ভেনলাল লোমা	দারছাই গ্রাম ও বেতছড়া গ্রাম, কুমারঘাট, উত্তর ত্রিপুরা ।